অনুবাদকের প্রকাশিত বইসমূহঃ

১. মীলাদুন্নবী (দঃ)'র প্রামাণ্য দলিল
২. মহানবী (দঃ) হাযের-নাযের
৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে মহানবী (দঃ)'র অদৃশ্য জ্ঞান
৪. কুতুবে জমান কাজী আসাদ আলী (রহঃ)
৫. হযরত মওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (রহঃ)
৬. নব্য ফিতনা সালাফিয়্যা
৭. ওহাবীদের প্রতি নসীহত
৮. তাসাউফ প্রবন্ধ সমগ্র
৯. মাযহাব অমান্যকারীদের খণ্ডন
১০. আহলে হাদীস মতবাদের খণ্ডন
১১. ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)'র প্রতি অপবাদের জবাব
১২. সেমা'
১৩. ওহাবীদের সংশয় নিরসন
১৪. বাইবেল, কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)
১৫. বাইবেল কি খোদার বাণী?
১৬. ফীহি মা ফীহি
১৭. ঈমান ও ইসলাম
১৮. সুন্নী দৃষ্টিকোণ হতে গাদীরে খুম-সংক্রান্ত হাদীসের বিশ্লেষণ
১৯. মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
২০. সৈয়দ মওলানা এ. জেড. এম. সেহাবউদ্দীন খালেদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
২১. লুম'আতুল ই'তিক্বাদ
২২. শায়খ আলবানীর স্ববিরোধিতা
২৩. ফাদাক বাগান ও ভ্রান্ত শিয়া মতবাদের রদসূচক প্রবন্ধসমূহ
২৪. অকাট্য প্রামাণ্য দলিল (হুজাজে ক্বাতে'আ)
২৫. সূরা ফাতিহা'র তাফসীর
২৬. আহলে বাইত (রাঃ) ও আসহাব (রাঃ)-এর প্রতি ভক্তিতে মুক্তি

প্রকাশিতব্য বইসমূহঃ

১. সংশোধনীয় ভ্রান্ত ধারণা
২. আমীরে মু'আবিয়া (রাঃ)'র পক্ষে জবাব
৩. জওয়াহিরুল কুরআন
৪. তাদবিরাতুল ইলাহিয়া
৫. হাদীসে সাকলাইন
৬. সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বইসই
বইয়ের সাথে সারাক্ষণ...
Available on boisoibd.com

কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে আহলে বাইত (রা.) পরিচিতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ ❖ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

বইসই

কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে

আহলে বাইত (রা.)

পরিচিতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ

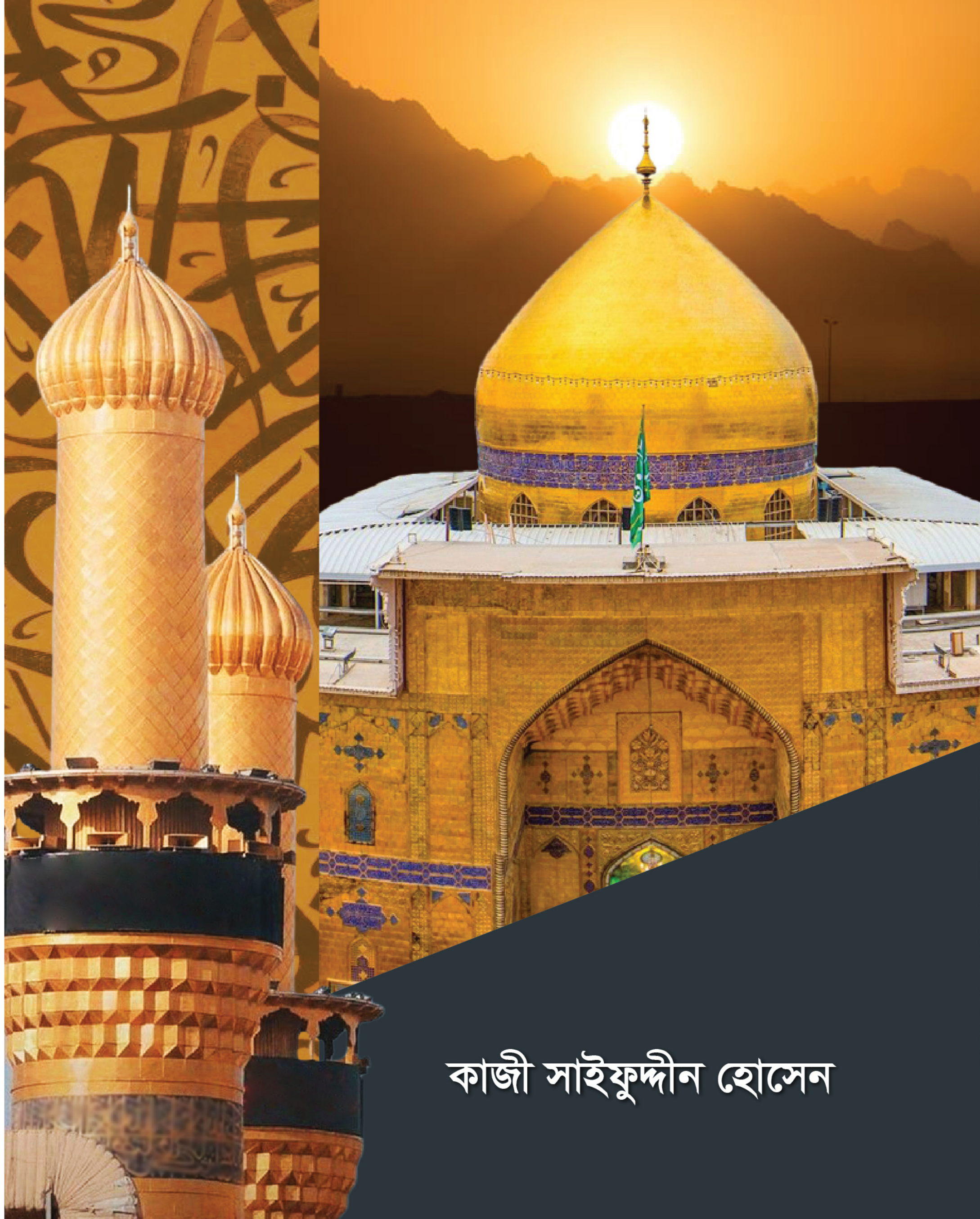

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে আহলে বাইত (রা.) পরিচিতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ

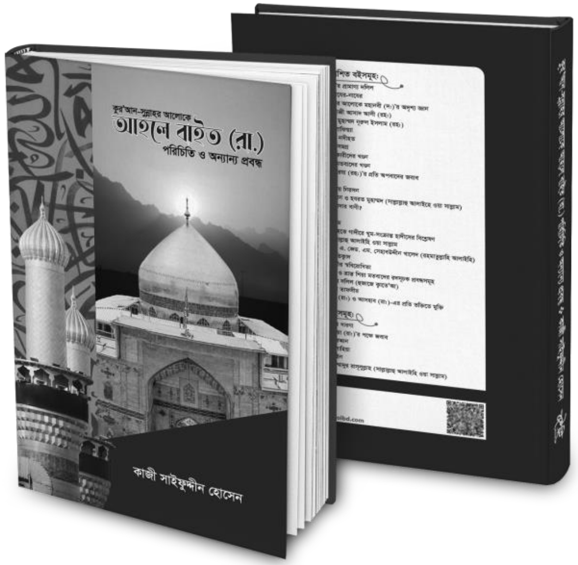

অনুবাদক ও সংকলক
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

বইসই

কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে আহলে বাইত (রা.)
পরিচিতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ

অনুবাদক ও সংকলক
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন
www.sufirealm.wordpress.com

প্রকাশক
বইসই
১৪, টিক্কাপাড়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন : ০১৯১৪১২০৬৬৮, ০১৬৩৭-৫৬০৫৫৩
www.boisoibd.com

[স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল
হযরত মওলানা শাহ সূফী আবুল মোকারেম মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব কেবলা (রহ.)'এর ৪৯ তম বেসাল বার্ষিকী উপলক্ষে (ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন
মোবাইল: ০১৩ ১২৫ ৯৪৯৪৫

মুদ্রণ
জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১১৭৬৭২৩
E-mail: joynabpress@gmail.com

হাদিয়া : ১৫০ টাকা

ISBN : 978-984-98899-6-0

Quran-Sunnahr Aloke Ahale Bayt (Ra.) Porichiti O Onnanno Probondho
Translator: Kazi Saifuddin Hossain, Published in December 2025
Published by **Boisoi**, Price : 150 tk

উৎসর্গ

পীর ও মুর্শীদ হযরত মওলানা শাহ সূফী সৈয়দ
এ. জেড. এম. সেহাবউদ্দীন খালেদ আল-ক্বাদেরী
ওয়াল-চিশতী সাহেব ক্বেবলা
(রহমতুল্লাহে আলাইহে)'এর পুণ্যস্মৃতিতে।

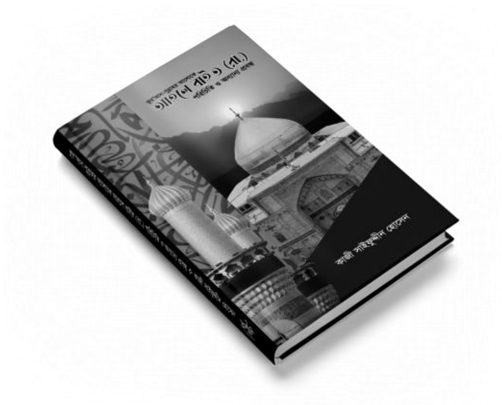

সূচিপত্র

- ❖ বঙ্গানুবাদকের কথা ---------- ০৯
- ❖ কুর'আনে বর্ণিত 'আহলে বাইত' শব্দের ব্যবহার ---------- ১১
  - ▪ শিয়াদের কিছু অপযুক্তির জবাব ---------- ২৫
- ❖ মুবাহিলার ঘটনাকে কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদের আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়ার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে? ---------- ৪৮
  - ▪ নবী (দ.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পর্কে ---------- ৭০
- ❖ সর্ব-হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর গুণ ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ---------- ৭৬
- ❖ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে ভালোবাসা ঈমানদারী ---------- ৯১
  - ▪ সম্মান প্রদর্শনসম্পর্কিত হাদীস ---------- ৯২
- ❖ ইমামে আলী (ক.) ও তাঁর পরিবারের দৃষ্টিতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) ও তাঁর দল ---------- ৯৪
  - ▪ ইমামে আলী (ক.) ও তাঁর পরিবারের দৃষ্টিতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) ও তাঁর দল ---------- ৯৪
  - ▪ ইমামে আলী (ক.)-এর ঘোষণার আলোকে সিফফীনের শহীদদের (শরঈ) হুকুম: তাঁরা সকলেই জান্নাতবাসী ---------- ৯৮

  - ▪ ইমামে আলী (ক.)-এর ঘোষণার আলোকে জামাল ও সিফফীনের অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ---------- ৯৯
  - ▪ ইমামে আলী (ক.)-এর ভাষ্যে বাগী শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যাকরণ ---------- ১০১
- ❖ "ঈদে গাদীর" রচনা সম্ভার ---------- ১০৪
  - ▪ ঈদে গাদীর সম্পর্কে সুন্নী দৃষ্টিভঙ্গি ---------- ১০৪
- ❖ গাদীরে খুমে হযরত আলী (ক.)-কে প্রদত্ত 'মওলা' উপাধি সম্পর্কে রাফেযী ব্যাখ্যা কী? ---------- ১০৬
- ❖ খেলাফত ও বেলায়াত ---------- ১০৮
  - ▪ ইসলামী খলীফা (রা.)-বৃন্দের সবাই কি বাতেনী পূর্ণতাপ্রাপ্ত নন? ---------- ১১০
- ❖ রাফেযী শিয়াচক্রের একটি ভুয়া দাবি ---------- ১১৪
- ❖ গাদীরে খুমে খেলাফত/ইমামত মঞ্জুর হয়নি মর্মে হযরত আলী (ক.)'এর সমর্থনসূচক ভাষ্য ---------- ১১৬
- ❖ গাদীরে খুমে মওলা আলী (ক.)-এর বেলায়াতের অভিষেক হয়নি, হয়েছে কুর'আনের মক্কী সূরায় ---------- ১১৯
  - ▪ ফেসবুকে প্রশ্ন ও তার জবাব ---------- ১২০
- ❖ রাফেযী-চক্রের ধোঁকা ভঞ্জন ---------- ১২৩
- ❖ হিজরী নববর্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে শরঈ দলিল ---------- ১২৯
- ❖ রাফেযী-শিয়া চেনার সহজ উপায় ---------- ১৩৩
  - ▪ ভূমিকা ---------- ১৩৩
  - ▪ ইমামে আলী (ক.) সম্পর্কে আমাদের আকীদাহ ---------- ১৩৩
  - ▪ আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রসঙ্গ ---------- ১৩৭
  - ▪ শিয়া চেনার সহজ পদ্ধতি ---------- ১৩৭
- ❖ খলীফা উসমান (রা.)'এর শাহাদাত ১৮ যিলহজ্জ, ১২ তারিখ নয় ---------- ১৩৮
  - ▪ হাযরাত উসমান (রা.) এর শাহাদাত ১২ই জিলহজ্জ না হওয়ার কারণ ---------- ১৪০

❖ ঈমাম নাসাঈ (রহিঃ)-এর নামে হাযরাত মুআবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে শিয়াদের মিথ্যাচারের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ---------- ১৪২
- মুয়াবিয়া (রা.)-এর সম্পর্কে আন-নাসায়ীর প্রশংসা ---------- ১৪৪

❖ ইমাম হাসান (রা.)'এর খেলাফত ত্যাগের নেপথ্যে ---------- ১৫৫
❖ ইমাম হুসাইন (রা:) ও আহলে বায়ত (রা:)-বিষয়ক গবেষণা ---------- ১৫৭
❖ হযরত যায়দ (রা.)'কে 'মওলা' সম্বোধনবিষয়ক হাদীস ---------- ১৬০
❖ আমীরে মু'আবিয়া (রা:) কেন তাঁর ছেলে এয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করেন? ---------- ১৬৩
❖ হযরত মু'য়াবিয়া (রা.) উত্তরাধিকারী নির্বাচনে জুলূম করেছিলেন কি? ---------- ১৭৬
- সুন্নী দৃষ্টিতে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ ---------- ১৭৮

❖ ডক্টর তাহিরুল কাদেরি কি ইয়াযীদের দোসর? ---------- ১৮৩
❖ আফযালীয়্যাত তথা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক বাহুল্য তর্ক ও তার জবাব ---------- ১৮৬
- অনলাইনে ধর্মনীতির অনুসরণ, না এজেন্ডার বাস্তবায়ন? ---------- ১৮৮
- প্রিয়নবী (ﷺ) কর্তৃক হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নামাযে ইমামতির নিয়োগ দান ছিলো প্রতীকী ---------- ১৯০
- সাহাবা (রা.)-বৃন্দের প্রতি মন্দ ধারণা রাখার বিষয়টি কবরের প্রশ্নোত্তরে প্রভাব ফেলবে কি-না? ---------- ১৯১
- হিজরতকালে শত্রুপরিবেষ্টিত গুহার ভেতরে হযরত আবূ বকর (রা.) নিজের জন্যে দুঃখ করেছিলেন কি? ---------- ১৯২
- হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ---------- ১৯৩

❖ সুন্নী ছদ্মবেশী শিয়া মৌ-লোভীদের প্রতি প্রশ্ন ---------- ১৯৬
- ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য ---------- ১৯৮

সংকলক ও বঙ্গানুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم،

نحمده ونصلّي على رسوله الكريم،

أمّا بعد.

আমাদের দাদাপীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবূল মোকারেম মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব কেবলা (রহমতুল্লাহি আলাইহ)-এর ৪৯তম বেসাল বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এবারের বইটি মুসলমান সমাজে বিরাজমান কিছু ভুল ধারণাকে সংশোধন করার মহৎ লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছে। এ কাজে আমরা আন্তর্জাতিক কয়েকটি সাইটের লেখা অনুবাদ করেছি, এর পাশাপাশি দেশীয় উলামাবৃন্দের লেখাও সন্নিবেশিত করেছি। আর এ অধমের কিছু গবেষণামূলক লেখাও এতে যুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে - Youpuncturedtheark.wordpress.com (আল ও আসহাব রা.-এর পক্ষে জবাব); www.mahajjah.com; Q&A South Africa; আরেকটি Q&A ওয়েবসাইট ইত্যাদি। আর দেশের দু'জন মওলানা ও ফেসবুক বন্ধু সর্ব-জনাব মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন এবং মাহমূদ হাসান তাঁদের মূল্যবান লেখনী দ্বারা এ সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় Q&A ওয়েবসাইটের লেখাটির গুরুত্বপূর্ণ আরবী রিসোর্স সরবরাহ করেছেন মওলানা ও ফেসবুক বন্ধু মুহাম্মদ রুবাইয়াত বিন মূসা। আমরা তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বইটির প্রকাশক বইসই প্রকাশনী। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে, আমাদের পীর ও মুর্শীদ সৈয়দ মওলানা এ. জেড. এম. সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব কেবলা (রহমতুল্লাহি আলাইহ)-এর অসীলায় এ বইটি মহান রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে গৃহীত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে, আমীন।

- কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

কুর'আনে বর্ণিত 'আহলে বাইত' শব্দের ব্যবহার

মূল: আ'ল ও আসহা'ব (রা.)-বৃন্দের পক্ষে জবাব শীর্ষক ওয়েবসাইট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
আম্মা বা'আদ।

আহল্ কিংবা আহলে বাইত যখন কোনো পুরুষের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ করা হয়, তখন তা সর্বদা তাঁর পরিবারকেই বোঝায়, যা প্রধানত তাঁর স্ত্রী। এমন কী কুর'আনেও আহল/আহলে বাইত শব্দগুলো কোনো ব্যক্তির স্ত্রীকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা কুর'আনের কয়েকটি উদাহরণ থেকে এটা প্রমাণ করবো।

উদাহরণ-১

وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থ: এবং তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং স্ত্রীলোকটা তাঁর জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে ফেল্লো আর তারা উভয়েই স্ত্রীলোকটার স্বামীকে দরজার নিকট পেয়েছিলো। (স্ত্রীলোকটা) বল্লো, 'কী শাস্তি হতে পারে তার, যে তোমার গৃহিণীর (আহলি'র) সাথে কুকর্ম কামনা করে, কিন্তু এ যে, তাকে কারাগারে বন্দী করা হোক কিংবা কষ্টদায়ক শাস্তি।'[১]

কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতে আযীযের স্ত্রীকে "আহলি" বলা হয়েছে, এমন কী শিয়া তাফসীরও এটা নিশ্চিত করেছে।

কেলেঙ্কারি থেকে (স্ত্রীলোকটির) নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার কামুক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার জন্য পয়গাম্বর ইউসুফ (আলাইহিস্

---

[১] শিয়াপন্থী শাকির সাহেবের তাফসীরটি সুন্নী তাফসীরে নূরুল ইরফানেরই অনুরূপ; কুর'আন ১২/২৫।

সালাম)-কে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা তাকে গ্রাস করেছিলো। একটি ভালোমানুষী চেহারা ধারণ করে সে তার স্বামীর দিকে সরাসরি তাকায় এবং ইউসুফ (আলাইহিস্ সালাম)-কে তার বিরুদ্ধে কুকর্মের অভিপ্রায়ের জন্যে অভিযুক্ত করে এবং এর শাস্তিস্বরূপ জেলখানা বা কঠিন শাস্তি চায়। আয়াতটি বলে: "কী শাস্তি হতে পারে তার, যে তোমার গৃহিণীর (আহলি'র) সাথে কুকর্ম কামনা করে, কিন্তু এ যে, তাকে কারাগারে বন্দী করা হোক কিংবা কষ্টদায়ক শাস্তি।"[২]

উদাহরণ-২

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَاصِحُونَ.

অর্থ: এবং আমি পূর্ব থেকেই সমস্ত ধাত্রীকে তার (মানে মূসা আলাইহিস্ সালামের) জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম যতোক্ষণ না (তার বোন এলো এবং) বল্লো, "আমি তোমাদেরকে কি এমন পরিবারের (আহলে বাইতের) সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের এ শিশুকে লালনপালন করবে এবং তারা তার মঙ্গলকামী?"[৩]

এমন কী ওপরের আয়াতে পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর মাকেও আহলে বাইত বলা হয়েছে, আর তা এ কারণে নয় যে তিনি একজন নবীর মা ছিলেন, বরং এ কারণে যে তিনি পয়গাম্বর ইমরান (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী ছিলেন। আর শিয়া পণ্ডিত আক্বা-পূয়্যা মাহদী যাঁর তাফসীরটি বহুলপ্রচারিত শিয়া ওয়েবসাইট al-islam.org কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি ও তাঁর মতো কিছু লোক এই আয়াতটিকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। তাঁরা মনে করেন যে এখানে পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর মাকে আহলে বাইত বলা হয়েছে, কেননা তিনি একজন নবীর মা ছিলেন। না, এটা ভুল উপলব্ধি, কেননা পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্

---

[২] পবিত্র কুর'আনের জ্যোতি/Light of the Holy Qur'an; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কামাল ফাগিহ ঈমানী ও এক দল শিয়া মুসলিম পণ্ডিত কৃত তাফসীর, ১২/২৫।
[৩] নূরুল ইরফান, ২৮/১২।

সালাম)-এর বোন যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা ফেরাউনের সৈন্যদের উদ্দেশ্যেই ছিলো। যদি পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর বোন ওই মহিলাকে পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর মা হওয়ার কারণে 'আহলে বাইত' বলে সম্বোধন করতেন, তাহলে সেখানকার লোকেরা অবশ্যই তাঁকে প্রশ্ন করতো যে কে তাঁর সন্তানের মা আর কেন তিনি শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়েছিলেন? এবং এরপর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতো।

একটি ভিন্ন শিয়া তাফসীরগ্রন্থে (ওপরের) অনুরূপ বলা হয়েছে:

"(মূসা আলাইহিস্ সালামের বোনের এ বক্তব্যে) ফেরাউনের লোকেরা খুশি হয় এবং তাঁর সাথে ওই মহিলার কাছে চলতে আরম্ভ করে। মূসা আলাইহিস্ সালামের বোন যিনি নিজেকে অপরিচিত ও আগন্তুক হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি শিশুর (মানে পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামের) মাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানান।"[৪]

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ.

আর মানুষেরা যদি তাঁদের সাধারণ জ্ঞান/বুদ্ধি-বিবেচনা ব্যবহার করেন, তবে তাঁরা এই আয়াতটি হতে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর বোন কোনোভাবেই মূসা (আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর মায়ের মধ্যে কোনো সম্পর্কের ইঙ্গিত দেননি। যদি তিনি তা করতেন, তাহলে তিনি মহাবিপদে পড়তেন। কিন্তু তিনি মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর মাকে "আহলে বাইত" বলে সম্বোধন করেছিলেন স্রেফ এ কারণে যে তিনি একজন ব্যক্তির (তথা পয়গাম্বর ইমরান আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী ছিলেন।

[৪] পবিত্র কুর'আনের জ্যোতি/Light of the Holy Qur'an; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কামাল ফাগিহ ঈমানী ও এক দল শিয়া মুসলিম পণ্ডিত কৃত তাফসীর, ২০/৪০।

এটা সম্ভব যে শিয়াদের দ্বারা উত্থাপিত অযৌক্তিক দাবিগুলোর অকাট্য ও যৌক্তিক জবাব পাঠের পরে তাঁরা তাঁদের তত্ত্বগুলো হতে ইউ-টার্ন/ডিগবাজি খাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন যে এই আয়াতে একটি গোটা পরিবারকে সম্বোধন করা হয়েছে, শুধুমাত্র একজন মহিলাকে নয়। এমতাবস্থায় এ ধরনের অপযুক্তির জবাব আমরা কুর'আন থেকেই দেবো। কেননা সর্বোত্তম পন্থা হলো কুর'আনের দ্বারা কুর'আনকে ব্যাখ্যা করা। এটা এ কারণে যে, কুরআন তার কোনো এক জায়গায় যা ইঙ্গিত করে, তা তার অন্য জায়গায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে এবং কোনো এক জায়গায় সংক্ষেপে যা বলে তা অন্য জায়গায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়।

কুর'আন মজীদ ঘোষণা করে:

ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ.

অর্থ: দেখো, আমি কীভাবে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতগুলো বিবৃত করছি, যাতে কখনো তাদের বোধশক্তির উদয় হয়।[৫]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.

অর্থ: এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্যে এ কুর'আনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি। অতঃপর অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছু মানলো না।[৬]

কুর'আন থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এ ঘটনায় একটি গোটা পরিবারের প্রয়োজন ছিলো না, বরং শুধুমাত্র একজন (ধাত্রী) মহিলারই প্রয়োজন ছিলো যিনি শিশুটিকে লালন-পালন করতে সক্ষম। তাহলে কেন পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর বোন তাঁর কথায় একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে বোঝাবেন? তাছাড়া, কুর'আনের আরেকটি আয়াতে এই বিভ্রান্তি নিরসনে আরো স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, যা দ্বারা বোঝা যায় পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর বোন কি একটি সম্পূর্ণ পরিবারের কথা

[৫] আল-কুর'আন, ৬/৬৫, নূরুল ইরফান।
[৬] আল-কুর'আন, ১৭/৮৯; নূরুল ইরফান।

বলেছিলেন, না "আহলে বায়ত" শব্দটি দ্বারা কেবলমাত্র একজন মহিলাকে বুঝিয়েছিলেন?

পাক কালামে এরশাদ হয়েছে:

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ.

অর্থ: তোমার (মূসার) বোন চল্লো (তাদের কাছে), অতঃপর বল্লো, "আমি কি তোমাদেরকে তারই কথা বলে দেবো, যে এ শিশুর প্রতিপালন করবে?"[৭]

শিয়া তাফসীরবিদবর্গও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করেন:

"ফেরাউনের লোকদেরকে (মূসা আলাইহিস্ সালামের) বোন জিজ্ঞেস করেন তিনি কি এমন কোনো 'নারী'র সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবেন যিনি শিশুটিকে প্রতিপালন করতে সক্ষম? আয়াতটি আরো বলে, 'আমি কি তোমাদেরকে তার কাছে পরিচালিত করবো, যিনি তাকে লালনপালন করবেন?' হয়তো তিনি (মানে বোন) আরো যোগ করেছিলেন যে এই 'মহিলার' বুকের দুধ জারি ছিলো যা তিনি (বোনটি) নিশ্চিত জানতেন ওই শিশু গ্রহণ করবেন।"[৮]

অনলাইনে প্রচারিত শিয়া ওয়েবসাইট Al-Islam.org, যেটাতে পূয়্যা/এম,এ, আলীর খাঁটি শিয়া তাফসীর রয়েছে, তাতে বলা হয়: যখন শিশুটিকে ফেরাউনের পরিবার (নদী থেকে) তুলে এনেছিলো এবং তারা শিশুটিকে ভালোবাসে বলে মনে হয়েছিলো, তখন তিনি (বোন) তাদের সামনে হাজির হন এবং শিশুটির জন্য একজন ভালো "ধাত্রী" আনার প্রতিশ্রুতি দেন।

একই কথা বলা হয়েছে আরেকটি শিয়া তাফসীরগ্রন্থে যার শিরোনাম 'তাফসীরে নমুনা' ৭ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

এমন কী সুন্নী তাফসীরবিদবৃন্দও একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

[৭] আল-কুর'আন, ২০/৪০; নূরুল ইরফান।

[৮] পবিত্র কুর'আনের জ্যোতি/Light of the Holy Qur'an; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কামাল ফাগিহ ঈমানী ও এক দল শিয়া মুসলিম পণ্ডিত কৃত তাফসীর, ২০/৪০।

তিনি (বোন) তখন বলেন, "আমি কি তোমাদের এমন 'কাউকে' দেখাবো যিনি তার (শিশুর) যত্ন নেবেন?" তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তিনি তাদের কাছে শিশুর 'মাকে' নিয়ে আসেন আর শিশু তাঁর বুকের দুধ পান (আরম্ভ) করেন।[৯]

তিনি (বোন) বুঝিয়েছিলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন 'কারো' কাছে নিয়ে যাবো যিনি তাকে (শিশুকে) তোমাদের জন্যে লালনপালন করতে পারবেন একটি (নির্দিষ্ট) মজুরির ভিত্তিতে?" অতঃপর তিনি তাঁকে (মানে শিশুকে) নিয়ে চল্লেন আর তারা তাঁর (মানে বোনের) সাথে গেলো শিশুর আসল মায়ের কাছে।[১০]

কুর'আন নিজেই এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝির উত্তর দেয়, যেখানে এটা পরিষ্কার করে যে পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর বোন কোনো একজন মহিলাকেই "কাউকে" বলে উল্লেখ করেছেন। কুর'আন নিজেই নিজের সেরা ভাষ্যকার। ঐশীগ্রন্থটি অধ্যয়নে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই এ কথাটি কতোখানি সত্য! কুর'আনের অনুচ্ছেদগুলোর একটি যত্নশীল তুলনা এবং সেগুলোর সংযোজন ও সমন্বয় সাধন অনেক অসুবিধা দূর করে দেয়।

অধিকন্তু, যদি যুক্তির খাতিরে আমরা একমতও হই যে এতে একটা গোটা পরিবারের কথা বলা হয়েছিলো, তবুও কেউ এই সত্যটিকে অস্বীকার করতে পারবেন না যে পয়গাম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর মা এতে (মানে আহলে বাইত শব্দে) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; আর তা সন্তানের (মানে মূসা আলাইহিস্ সালামের) মা হওয়ার কারণে নয়, বরং পয়গাম্বর ইমরান (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী হওয়ার কারণেই, যা ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

[৯] তাফসীরে জালালাইন, ২০/৪০।

[১০] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২০/৪০।

উদাহরণ-৩

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّيۤ آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّيۤ آتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.

অর্থ: অতঃপর যখন মূসা আপন (চুক্তির) মেয়াদ পূরণ করে দিলো এবং তাঁর নিয়োগকর্তাকে ছেড়ে আপন বিবিকে (আহলিহি) নিয়ে যাত্রা করলো, তখন (তার পথের ওপর) 'তূর' (সিনাই) পর্বতের দিক থেকে এক আগুন দেখতে পেলো। আপন পরিবার (আহলি)-কে বল্লো, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, তূর পর্বতের দিক থেকে এক আগুন আমার নজরে পড়েছে। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে কিছু খবর নিয়ে আসতে পারি, অথবা তোমাদের জন্যে কোনো অঙ্গার নিয়ে আসবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।'[১১]

ওপরের আয়াতের অনুবাদেও শিয়া অনুবাদক হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রীকে "আহল" বলে উল্লেখ করেছেন।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْلِهِ إِنِّيۤ آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.

অর্থ: (স্মরণ করুন সে ঘটনা) যখন মূসা (আলাইহিস্ সালাম) নিজের 'স্ত্রীকে' বল্লেন, 'আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি (অথবা আমি আগুনে এক ঝলক ভালোবাসা ও ভালোলাগা অনুভব করেছি)। এ থেকে আমি তাড়াতাড়িই সুসংবাদ নিয়ে আসবো (যার জন্যে আমরা বহুদিন ধরে মরুভূমি ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি)। অথবা আমি (তোমার জন্যে ওখান থেকেও) কিছু জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আসবো যাতে করে তুমিও (এর তাপ থেকে) উষ্ণতা অনুভব করতে পারো।'[১২]

---

[১১] শিয়াপন্থী অনুবাদক সারওয়ার, আল-কুর'আন ২৮/২৯।

[১২] ড: তাহিরুল কাদরী কৃত (বাংলা) ইরফানুল কুর'আন, ২৭/৭।

শিয়া তাফসীরসমূহ:

তাফসীরে মজমু'আয়ে বয়ান গ্রন্থে বিবৃত হয় -

قال الزجاج: العامل في إذ أذكر أي أذكر في قصة موسى إذ قال لأهله أي امرأته وهي بنت شعيب.

অর্থ: আল-যাজাজ বলেন, অর্থাৎ মনে রাখবেন মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর ঘটনায় যখন তিনি তাঁর আহল্ (إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْلِهِ) তথা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন এবং তিনি ছিলেন পয়গাম্বর শুয়াইব (আলাইহিস্ সালাম)-এর কন্যা।[১৩]

"যখন তাঁর (মানে মূসা আলাইহিস্ সালামের) জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মনে উদয় হলো, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হলেন।"[১৪]

যদিও কিছু শিয়াপন্থী তাফসীরকারক এমন একটি উপমা দিয়েছেন যা ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণিক উৎসগুলো দ্বারা সমর্থিত নয় এবং এটা শুধুমাত্র খ্রীষ্টান সূত্রের উপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সাথে তাঁর দুই পুত্রও ছিলেন, তবুও তাঁরা অস্বীকার করেন না যে তাঁর "স্ত্রী"-ও তাঁর সাথে ছিলেন যখন তিনি ভ্রমণ করছিলেন। আর এই আয়াতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করেছিলেন। তাই যদি কেউ অস্বীকার করার চেষ্টা করে যে কোনো নবী (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী তাঁর আহল-এর অংশ নন কারণ তাঁকে (হয়তো ভবিষ্যতে) তালাক দেয়া হতে পারে, তাহলে সেই ব্যক্তি কুর'আনের ওই আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে, যেখানে আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-মণ্ডলীর "স্ত্রীবৃন্দ"কে "আহল/আহলে বাইত" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যদি হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সন্তানবৃন্দ (ওই সময়ে) তাঁর সাথে থাকেনও এবং তিনি তাঁদের সাথে ভ্রমণও করেন, তবুও তিনি যখন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সম্বোধন করেছিলেন তখন তিনি

---

[১৩] তাফসীরে মজমু'আয়ে বয়ান, সূরাহ নমল, ৭ম আয়াতের ব্যাখ্যা।

[১৪] তাফসীরুল কুর'আন, প্রণেতা: জা'ফর হাসান, প্রতিষ্ঠাতা: জামেআ ইমামিয়া, ৩য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, সূরাহ-২০, আয়াত-১০।

"আহল" শব্দটি ব্যবহারই করতেন না যদি তাঁর স্ত্রী তাঁর "আহল" তথা পরিবারের অংশ না হতেন। তাছাড়া, হযরত মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর পুত্রদের কেউই তাঁর পরে ইমাম বা নবী হননি। তাই শিয়াবর্গ হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রীর জন্য যে উপমা ব্যবহার করার চেষ্টা করেন এ মর্মে যে তিনি নবীদের মা হওয়ার কারণে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাও এখানে রদ হয়ে গেছে।

আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আসি, আয়াতটি থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের স্ত্রীমণ্ডলী তাঁদেরই আহলে বাইত।

উদাহরণ-৪

إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمۡ أَجۡمَعِينَ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ.

অর্থ: কিন্তু লূতের পরিবারবর্গ (আ'ল); তাদের সবাইকে আমরা রক্ষা করবো; ব্যতিক্রম শুধু তার স্ত্রী, যার (ভাগ্যে) পেছনে পড়ে থাকার সর্বনাশ (বিধানকৃত)।[১৫]

এই আয়াতে "ব্যতিক্রম শুধু তার স্ত্রী" মর্মে বাক্যটি অর্থবোধক হতো না, যদি স্ত্রীলোকটি পয়গাম্বর লূত (আলাইহিস্ সালাম)-এর পরিবার (আ'ল) না হতো। নতুবা হযরত লূত (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী যে তাঁর (মানে লূত আলাইহিস্ সালামের) পরিবারের রক্ষা পাওয়ার বিষয়টির একটি ব্যতিক্রম তা আল্লাহকে কেন স্পষ্ট করতে হতো?

আর মনে রাখবেন, আমরা ইতিপূর্বে একটি নিবন্ধে আরবী ব্যাকরণবিদদের এমন উদ্ধৃতি দিয়েছি যা'তে তাঁরা বলেছেন যে আহল্ (أهل) এবং আ'ল (آل) একই অর্থবোধক।

এমন কী একটি শিয়া তাফসীরগ্রন্থও একই কথা স্বীকার করেছে যে পয়গাম্বর লূত (আলাইহিস্ সালাম)-এর পরিবারে তাঁর স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত ছিল:

[১৫] শিয়াপন্থী অনুবাদক সারওয়ার, কুর'আন, ১৫/৫৯-৬০।

"আয়াতটি ঘোষণা করে, 'কিন্তু লূতের পরিবারের সবাইকে আমরা রক্ষা করবো।' তবে আরবী - إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ - (কিন্তু লূতের পরিবার) মর্মে বাক্যটিতে - أَجۡمَعِينَ - (সবাইকে) শব্দটি যুক্ত করে জোর দেয়া হয়েছে, যার দরুন এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁর পরিবারের সকল সদস্য এমন কী তাঁর পথভ্রষ্ট স্ত্রীও, যে কুফফারদের সাথে সহযোগিতা করেছিলো; আর হয়তো বিষয়টি সম্পর্কে ইব্রাহীমের সচেতনতার সূত্রে ফেরেশতাবৃন্দ অবিলম্বে স্ত্রীলোকটিকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে নির্ধারণ করেন, এবং বলেন, 'তার স্ত্রী ব্যতিরেকে, যার সম্পর্কে আমরা বিধান করেছিলাম সে যেনো পেছনে থেকে যায় (শাস্তিস্বরূপ)।"[১৬]

উদাহরণ-৫

قَالَتۡ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٞ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيۡخًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عَجِيبٞ قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ.

অর্থ: সে বল্লো, 'হায় রে দুঃখ! আমার কী সন্তান হবে! এবং (আমি) হলাম বৃদ্ধা। আর এ আমার স্বামী বৃদ্ধ। নিঃসন্দেহে এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার।' ফিরিশতাবৃন্দ বল্লো, 'আল্লাহর কাজে কি তুমি বিস্ময়বোধ করছো? আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ তোমাদের প্রতি রয়েছে, ওহে এই পরিবারবর্গ (আহলে বাইত), নিঃসন্দেহে তিনিই সমস্ত প্রশংসার মালিক, সম্মানের অধিকারী।'[১৭]

এই আয়াতেও হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রীকে আহলে বাইত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাঁকে তা সম্বোধন করা হয়েছে

[১৬] পবিত্র কুর'আনের জ্যোতি/Light of the Holy Qur'an; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কামাল ফাগিহ ঈমানী ও এক দল শিয়া মুসলিম পণ্ডিত কৃত তাফসীর, কুর'আন, ১৫/৬০ আয়াতের ব্যাখ্যায়।

[১৭] কুর'আন ১১/৭২-৭৩; নূরুল ইরফান।

হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী হওয়ার কারণেই, যেমনটি খোদ কুর'আন মজীদের অপর একটি সুরাহতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ.

অর্থ: অতঃপর চুপচাপ আপন স্ত্রীর (আহলিহি) কাছে গেলো, তারপর এক মোটাতাজা গো-বৎস নিয়ে তার মেহমানদের কাছে ফিরে এলো।[১৮]

কিন্তু কিছু বিপথগামী লোক আছে যারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং তারা এই সরল আয়াতগুলোর ভুল, দুরূহ এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। তারা বলে, তাঁকে (বিবি সারাহকে) ওপরের আয়াতটিতে আহলুল বাইত হিসেবে ফেরেশতাবৃন্দ উল্লেখ করেছেন (পুত্র) পয়গাম্বর ইসহাক (আলাইহিস্ সালাম) গর্ভে আসার সুসংবাদ পাওয়ার পরপরই।

প্রথমতঃ কুর'আনে কোথাও বলা হয়নি যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন; কেবল তাঁকে একজন সন্তানের জন্মের সুসংবাদই দেওয়া হয়েছিলো মাত্র। তাছাড়া, একই আয়াতের মধ্যে একজন নাতির সুসংবাদও দেয়া হয়েছিলো। এমন কী পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা কোনো শিয়াও দাবি করবে না যে কেউ ওই একই সময়ে নাতিকেও গর্ভে ধরতে পারে, নাতির এই সুসংবাদের কারণে। একইভাবে, যখন বিবি মরিয়ম ('আলাইহাস্ সালাম)-কে পয়গাম্বর ঈসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর গর্ভে আসার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন না।[১৯]

দ্বিতীয়তঃ কুর'আনের **১১/৭১** আয়াতে ব্যবহৃত আরবী শব্দটি হচ্ছে - **ضحكت** - (দ্বহিকাত)। তবে শিয়া পণ্ডিতদের একটি বড় অংশ এর অর্থ - **حاضت** - তথা মাসিক (ঋতুস্রাব) হয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, তাদের পণ্ডিত আল-ফায়েদ আল-কাশানী (শিয়াদের মতে, তাঁর যুগের বিশিষ্ট পণ্ডিত) নিজ তাফসীরে বলেছেন: আল-আয়াশী ব্যক্ত করেন আস-সাদিক আলাইহিস্ সালামের (তরীক বা সূত্রে) এ মর্মে যে,

[১৮] শিয়াপন্থী অনুবাদক সারওয়ার, কুর'আন, ৫১/২৬।

[১৯] রেফারেন্স: ৩/৪৫, ১৯/১৯-২০ ইত্যাদি।

দ্বহিকাত মানে হা'যত (তাঁর ঋতুস্রাব হয়), যা ঠিক আল-কুম্মীর মতো একই ভাষ্য, যিনি আরো বলেছেন যে অনেক সময় আগে থেকেই তাঁর মাসিক হয়নি।

আল-কুম্মী বলেন: দ্বহিকাত অর্থ হা'যত (তাঁর ঋতুস্রাব হয়); এবং এটা (অর্থাৎ তাঁর মাসিক চক্র) অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো (অর্থাৎ সে সময়ে ঋতুস্রাব হওয়ার আগে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মাসিক হয়নি)।

শিয়াদের কিতাবে (কথিত) সহীহ ইসনাদ-সহ আরেকটি হাদীস্ রয়েছে, যা'তে এ বিষয়ে বলা হয়েছে।

في كتاب معاني الأخبار أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «فضحكت فبشرناها بإسحاق» قال: حاضت.

আস্ সাদূক্ব প্রণীত 'মা'আনীউল আখবার'গ্রন্থে (কথিত) সহীহ হাদীসে আমাদের বলা হয়েছে যে এই ব্যাখ্যা (মানে তাঁর মাসিক হয়েছিলো) মাসূম/নির্ভুল ইমামবৃন্দের একজন কর্তৃক সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, এ (কথিত) হাদীসে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছে যে এবারের আগে তাঁর দীর্ঘকাল যাবৎ মাসিক (ঋতুস্রাব) হয়নি, যেমনটি আল-কুমী ওপরে উল্লেখিত তাঁর বক্তব্যে প্রতিপাদন করেছেন। এর অর্থ পয়গাম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের বিবি সাহেবা ওই সময় গর্ভবতী ছিলেন না। কোনো গর্ভবতী মহিলার মাসিক হয় না। এরই ভিত্তিতে আমার প্রশ্ন হলো: এই পণ্ডিতবর্গ এবং আস্-সাদিক (তাদের মতে যিনি নির্দোষ/মা'সূম) প্রমুখের মতানুযায়ী, এবং তাঁরা যে উপলব্ধি তুলে ধরেছেন সেই অনুসারে, বিবি সারাহকে কেন আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে যদি সে সময় তিনি গর্ভবতী না হয়ে থাকেন?

উপরন্তু, একটি শিয়া তাফসীরগ্রন্থে এমন কী সেসব শিয়ার এই ভুল বোঝাবুঝির খণ্ডনও করা হয়েছে, যারা যুক্তি দেখায় যে হযরত ইব্রাহীম

(আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রীকে নবী (আ.)-দের মা হওয়ার কারণে আহলে বাইত বলা হয়েছিলো।

প্রশ্ন: উপরোক্ত আয়াতে (১১:৭৩) বিষয়টি বিবেচনা করে ফেরেশতাবৃন্দ পয়গাম্বর ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রীকে 'আহলে বাইত' বাক্য ব্যবহার করে সম্বোধন করেছেন এবং যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকের স্ত্রীকে তাঁর পরিবারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে কেন এমনটি হলো যে সূরাহ আল-আহযাবে ব্যক্ত তাতহীরের আয়াতটিতে[২০] প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদেরকে তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

জবাব: "শব্দের শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে 'আহলে বাইত' শব্দটিতে কারো স্ত্রীর উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক।"[২১]

সুতরাং এই শিয়া তাফসীরগ্রন্থটি একমত যে কুর'আনের ১১:৭৩ আয়াতে ওই মহিলাকে 'আহলে বাইত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রী হওয়ার কারণেই।

উপরন্তু, কুর'আনের আরেকটি আয়াত শিয়াদের এই দাবিকে খণ্ডন করেছে এ কারণে যে হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর স্ত্রীকে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়ার আগেও "আহলি" বলা হয়েছিলো:

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.

অর্থ: অতঃপর চুপচাপ আপন স্ত্রীর (আহলিহি) কাছে গেলো, তারপর এক মোটাতাজা গো-বৎস নিয়ে তার মেহমানদের কাছে ফিরে এলো।[২২]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً.

[২০] ৩৩/৩৩; নোট: শিয়াদের অপযুক্তির ১ নং খণ্ডনে বিস্তারিত।

[২১] পবিত্র কুর'আনের জ্যোতি/Light of the Holy Qur'an; আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কামাল ফাগিহ ঈমানী ও এক দল শিয়া মুসলিম পণ্ডিত কৃত কুর'আনের তাফসীর, ৭ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, 'লূত (আলাইহিস্ সালাম)-এর নবুয়্যত' শিরোনামের অধীন, পৃষ্ঠা ২৭৬।

[২২] শিয়াপন্থী অনুবাদক সারওয়ার, কুর'আন, ৫১/২৬।

অর্থ: এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্যে এ কুর'আনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি। অতঃপর অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছু মানলো না।[২৩]

উদাহরণ-৬

আল্লাহ ঘোষণা করেন -

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَاةَ وَآتِينَ ٱلزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.

অর্থ: হে নবী (দ.)-এর স্ত্রীবৃন্দ! তোমরা অন্যান্য নারীর মতো নও, যদি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন কোরো না যেনো অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে; হ্যাঁ, ভালো কথা বলো। আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমনটি পূর্ববর্তী যুগের পর্দাহীনতা; আর নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো। হে নবীর পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) - আল্লাহ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন (তাতহীর) করে দেবেন।[২৪]

সবশেষে, উপরোক্ত আয়াতগুলোতে স্ত্রীদেরকেই বিশেষভাবে 'আহলে বাইত' নামে ডাকা হয়েছে মর্মে বিষয়টি নির্ধারণ করার পর আমরা আবারো একই জিনিস দেখতে পাই যে কুর'আন ৩৩:৩২-৩৩ আয়াতেও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদেরকে 'আহলে

[২৩] আল-কুর'আন, ১৭/৮৯; নূরুল ইরফান।

[২৪] আল-কুর'আন, ৩৩/৩২-৩৩; নূরুল ইরফান।

বাইত' বলা হয়েছে। অতএব, আমাদের ইতিপূর্বে প্রদর্শিত কুর'আনী সার্বিক উদাহরণগুলো হতে অনন্য কিছু আমরা এতে পাই না।

শিয়াদের কিছু অপযুক্তির জবাব

অপযুক্তি-১

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। একেক স্ত্রী একেক বাড়িতে থাকতেন। অতএব, যদি 'তাতহীরের' (৩৩/৩৩) আয়াতটি তাঁর সমস্ত স্ত্রীকে নির্দেশ করে থাকে, তবে এতে আহলুল বাইত/أهل البيت (গৃহের মানুষেরা) (একবচন/الْمُفْرَدُ) না বলে আহলুল বুয়ূত/أهل البيوت (গৃহসমূহের মানুষেরা) (বহুবচন/الْجَمْعُ) বলা উচিত ছিলো।

জবাব

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের এখানে 'পরিবারের সদস্য' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোন্ পরিবার তার সংজ্ঞা না দিয়েই। কিন্তু এটা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারকে বোঝায়, স্ত্রীদের পরিবারকে নয়। সুতরাং যেহেতু এটা নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি)-এর পরিবার, তাই এটা আহলুল বাইত (একবচন) হওয়া উচিত, আহলুল্ বুয়ূত (বহুবচন) নয়। আর তাঁর স্ত্রীবৃন্দসহ সকল সদস্য, আহলে কিসা এবং যাঁদের উপর সাদাকা হারাম, তাঁরা সকলেই আহলে বাইতের অধীন, কেননা এটা নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারকেই নির্দেশ করে - যদিও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বাড়িতে বসবাস করে থাকেন। অধিকন্তু, আমরা এমন একটি সুস্পষ্ট হাদীস্ পাই যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদেরকে আহলুল-বাইত বলা হতো, যদিও তাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে বসবাস করতেন।

وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم. قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين! أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت: نهانا، أهل البيت، أن ننتبذ في الدباء والمزفت.

অর্থ: ইব্রাহীম (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি আসওয়াদ (রা.)-কে বল্লাম তিনি মু'মিনদের মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিনা (কোন্ পাত্রে) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাবীয/মদ প্রস্তুত অপছন্দ করেছেন। তিনি (আসওয়াদ) বললেন: হ্যাঁ; আমি জিজ্ঞেস করলাম: মু'মিনদের মা, আমাকে সেসব পাত্র সম্পর্কে অবহিত করুন যেগুলোতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) (উত্তরে) বল্লেন: তিনি আমাদেরকে মানে তাঁর পরিবারের সদস্যদের [আহলুল বাইতকে] লাউ বা বার্নিশ করা পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি: আপনার কি মনে আছে সবুজ কলস, এবং (অন্য) কলস? তিনি (উত্তরে) বলেন: আমি যা শুনেছি তা তোমাকে বর্ণনা করলাম। আমি কি তোমাকে তা বর্ণনা করবো যা আমি শুনিনি?[২৫]

মন্তব্য: ওপরের হাদীসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীবৃন্দকে আহলুল বাইত (রা.) বলা হয়েছে, যদিও তাঁরা আলাদা আলাদা গৃহে বসবাস করতেন। এটা এ কারণে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক তাঁর সকল স্ত্রীর প্রতিই নিষেধাজ্ঞাটি দেয়া হয়েছিলো।

এ রকম আরেকটি উদাহরণ হলো যায়দ ইবনে আরকাম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি (সহীহ মুসলিম, কিতাব-৩১, হাদীস নং-৫৯২০) যা'তে তিনি বলেছেন সাদাকা গ্রহণ যাঁদের জন্যে হারাম তাঁরা আহলে বাইত (রা.),

[২৫] সহীহ মুসলিম, কিতাব-২৩, আন্তর্জাতিক নম্বর-৪৯১৮।

যদিও তাঁরা আলাদা আলাদা গৃহে বসবাস করেন। তিনি (রা.) এ কথা বলেননি তাঁরা আহলে বুয়ূত (গৃহসমূহের মানুষ)।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর আহল/মানুষেরা একটি পরিবার, আর তাই তাঁরা সবাই আহলু-বাইতিন্। যদি বলা হয় "আহলু-বুয়ূতিন", তাহলে এটা অনেকগুলো পরিবারকে বোঝাবে।

إِنَّا كُنَّا أَهْلَ بُيُوتٍ، وَكُنَّا إِنَّمَا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

মুসতাদরাক আল-হাকিম গ্রন্থে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলেন:

إِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ كَذَا وَكَذَا أَهْلَ بَيْتٍ وَأَظُنُّهُ قَالَ تِسْعَةَ أَبْيَاتٍ مَا فِيهِمْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

অর্থ: [মুহাম্মদের আ'ল (পরিবার) হলো এই এবং এই আহলু-বাইতিন, - আমি মনে করি তিনি নয়টি আবইয়াতের (গৃহের) কথা উল্লেখ করেন - সেগুলোর কোনোটিতেই এক সা'আ পরিমাণেও খাবার নেই।]

মন্তব্য: এর মানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহলুল বাইত/পরিবারবৃন্দ ছিলেন নয়টি গৃহে (বসবাসরত), যা দরিদ্র।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার একটি পরিবার, তবে তা তাঁর স্ত্রী/পরিবারের জন্য নয়টি গৃহ নিয়ে গঠিত। এই উদাহরণগুলো এবং এগুলোর মতো আরো অনেকগুলো উদাহরণ প্রমাণ করে যে আহলুল বাইত বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছিলো এবং এতে এমন কী বিভিন্ন বাড়িতে বসবাসকারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আহলুল বাইত হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার, তাঁর একটিই পরিবার, একাধিক পরিবার নয়। আহলুল্ বাইত হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার। আমরা আরবীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারকে 'পরিবারসমূহ' (জম'আ বা বহুবচনে) বলি না। এটা শুধুমাত্র একটা পরিবার, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার। এটা তাঁর মালিকানাধীন বাড়ির সংখ্যার সাথে যুক্ত নয়। আমরা জানি, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এবং হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে একই বাড়িতে থাকতেন না।

দ্বিতীয়তঃ শিয়াদের বারো ইমাম (রহ.) ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বসবাস করতেন এবং হযরতে ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর একই বাড়িতে বসবাস করতেন না। তাই যদি এখানে শিয়াদের ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটা অনেক শিয়া ইমামকেও আহলুল্ বাইত থেকে বাদ দেবে। অতএব, হয় শিয়াদের উচিত তাদের ভুল বোঝাবুঝি সংশোধন করা, নতুবা তাদের ইমামদেরকেও আহলুল্ বাইত থেকে বাদ দেয়া।

অপযুক্তি-২

পাল্টা যুক্তি -

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ.

অর্থ: হে ঈমানদার সকল! নবীর গৃহসমূহে হাজির হয়ো না যতোক্ষণ না অনুমতি পাও, যেমন - খানার জন্য আমন্ত্রিত হও, না এভাবে যে তোমরা নিজেরা তা রান্না হবার জন্য (দীর্ঘক্ষণ) অপেক্ষায় থাকবে।[২৬]

জবাব

এখানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'গৃহসমূহ' (বিশেষ্য/إسم) উল্লেখিত হয়েছে; তাই এটাকে বহুবচনে (الْجَمْعُ) হতে হবে। অথচ কুর'আনের ৩৩/৩৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহের মানুষদের (সমষ্টিবাচক

[২৬] শিয়াপন্থী অনুবাদক শাকির, আল-কুর'আন, ৩৩/৩৫; সুন্নী নূরুল ইরফান তাফসীরেরেই অনুরূপ।

বিশেষ্য/(إِسْم الجَمْع)। তাই এটাকে একবচনে (الْمُفْرَدُ) হতে হবে। কেননা প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে উল্লেখিত হচ্ছে গৃহসমূহ, অথচ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (কুর'আন ৩৩/৩৩) হলেন (একটি গৃহের) সদস্যবৃন্দ (أَهل) যা বহুবচন (الْجَمْعُ)।

এ রকম আরেকটি উদাহরণ হলো যায়দ ইবনে আরকাম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি[২৭] যা'তে তিনি বলেছেন সাদাকা গ্রহণ যাঁদের জন্যে হারাম তাঁরা আহলে বাইত (রা.), যদিও তাঁরা আলাদা আলাদা গৃহে বসবাস করেন। তিনি (রা.) এ কথা বলেননি তাঁরা আহলে বুয়ূত (গৃহসমূহের মানুষ)। তিনি এ সকল সদস্যদের জন্য আহলে বাইত শব্দটি উচ্চারণ করেন যাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে বসবাস করতেন।

অপযুক্তি-৩

(পাল্টা যুক্তি)-

أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ.

অর্থ: তবে কি জনপদসমূহের অধিবাসীরা এ ভয় করে না যে তাদের ওপর আমার শাস্তি রাতে আসবে যখন তারা নিদ্রারত থাকবে?[২৮]

আহলুল কুর'আ অর্থ জনপদ/শহরসমূহের মানুষেরা। উপরোক্ত আয়াতে মানুষদের উল্লেখ করা হলেও জনপদ/শহরসমূহ তথাপিও বহুবচন। আপনার ওপরের কথানুসারে তাহলে এতে উল্লেখিত শহরসমূহ (বহুবচন)-কে অবশ্যই শহর (একবচন) হতে হবে।

জবাব

এই যুক্তি যাঁরা উত্থাপন করেছেন তাঁদের মৌলিক ব্যাকরণগত দক্ষতা নেই, যার কারণে তাঁরা এই ধরনের যুক্তি উত্থাপন করেন।

[২৭] সহীহ মুসলিম, কিতাব-৩১, হাদীস নং-৫৯২০।

[২৮] শিয়াপন্থী অনুবাদক শাকির, কুর'আন, ৭/৯৭; সুন্নী নূরুল ইরফান তাফসীরেরই অনুরূপ।

কুর'আনের ৩৩/৩৩ আয়াতে 'বাইত/গৃহ' শব্দটি একবচন, কারণ এটা একক ব্যক্তির (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের কথা উল্লেখ করে। অথচ ওপরের উদাহরণে শহরগুলো বহুবচন, কেননা এটা কেবল একটা শহর নয়, বিভিন্ন শহরের লোকদের কথা উল্লেখ করে। এ কারণেই কুর'আনের ৩৩/৩৩ আয়াতে আপনি আহলে বুয়ূত নয়, বরং "আহলে বাইত" খুঁজে পান।

অপযুক্তি-৪

স্ত্রীবৃন্দ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে আপনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বাইত বলতে পারেন, কিন্তু 'আহলুল বাইত' বলতে পারবেন না। বিশেষ্য (إِسم) বা সর্বনাম (الضّمائر) বাইত শব্দের সাথে সংযুক্ত হলে 'আল' (ال) ব্যবহার করা হয় না। "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বাইত" এবং "আহলুল বাইত"-এর মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।

জবাব

এটা একটা মনগড়া নিয়ম যা সম্পূর্ণ ভুল। নিচে কিছু হাদীস পেশ করা হলো যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীবৃন্দ (রা.)-কে বাইত (بيت) শব্দের সাথে 'আল' (ال) যুক্ত করে সম্বোধন করেছেন।

এই হাদীস মুসলিম শরীফ গ্রন্থে বর্ণিত:

قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ۚ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ.

অর্থ: হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নিজে যায়নাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর ওয়ালীমাহ অনুষ্ঠানে ছিলাম। সে অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের তৃপ্তি সহকারে রুটি ও মাংস আহার করিয়েছিলেন। সে ওয়ালীমার দা'ওয়াত দেয়ার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন ওয়ালীমার কাজ শেষ করে উঠলেন আমিও তাঁর পেছন পেছন চললাম। তখনো দু'জন লোক ঘরে কথাবার্তায় ব্যস্ত রইলো, তারা বের হলো না। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রী (রা.)-বৃন্দের কাছে গেলেন এবং প্রত্যেককেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে পরিবারসদস্যরা (আহলুল বাইত/أَهْلُ الْبَيْتِ)! তোমরা কেমন আছো? উত্তরে প্রত্যেকেই বলেন, "আমরা ভাল আছি।"[২৯]

মন্তব্য: আমরা এখানে একটি সুস্পষ্ট হাদীস শরীফ পাই যা'তে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীমণ্ডলী (রা.)-কে 'আহলুল বাইত' বলা হয়েছে।

মুসলিম শরীফ হাদীসগ্রন্থ হতে আরেকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم. قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين! أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت: نهانا، أهل البيت، أن ننتبذ في الدباء والمزفت.

অর্থ: ইব্রাহীম (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি আসওয়াদ (রা.)-কে বল্লাম তিনি মু'মিনদের মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিনা (কোন পাত্রে) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাবীয/মদ প্রস্তুত অপছন্দ করেছেন। তিনি (আসওয়াদ) বললেন: হ্যাঁ; আমি জিজ্ঞেস করলাম: মু'মিনদের মা, আমাকে সেসব পাত্র সম্পর্কে অবহিত করুন যেগুলোতে আল্লাহর রাসূল

২৯ মুসলিম শরীফ, কিতাব-৮, হাদীস নং-৩৩২৮।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) (উত্তরে) বল্লেন: তিনি আমাদেরকে মানে তাঁর পরিবারের সদস্যদের [আহলুল বাইতকে] লাউ বা বার্নিশ করা পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি: আপনার কি মনে আছে সবুজ কলস, এবং (অন্য) কলস? তিনি (উত্তরে) বলেন: আমি যা শুনেছি তা তোমাকে বর্ণনা করলাম। আমি কি তোমাকে তা বর্ণনা করবো যা আমি শুনিনি?[৩০]

মন্তব্য: ওপরের হাদীসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীবৃন্দকে আহলুল বাইত (রা.) বলা হয়েছে, যদিও তাঁরা আলাদা আলাদা গৃহে বসবাস করতেন। এটা এ কারণে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক তাঁর সকল স্ত্রীর প্রতিই নিষেধাজ্ঞাটি দেয়া হয়েছিলো।

সহীহ বুখারী: আন্তর্জাতিক নম্বর ৩৩৭০:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي. فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ. قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থ: কায়স ইবনু হাফস ও মূসা ইবনু ইসমাঈল (রহঃ) ... আবদুর রাহমান ইবনু আবূ লায়লা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'আব ইবনু উজরা

৩০ সহীহ মুসলিম, কিতাব-২৩, আন্তর্জাতিক নম্বর-৪৯১৮।

(রাঃ) আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদীয়া দেবো না যা আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদীয়াটি দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কীভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কীভাবে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবো। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বলো, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারসদস্যদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি পয়গাম্বর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরিবার সদস্যদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারসদস্যদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারসদস্যদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

মন্তব্য: এই বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে সাহাবা (রা.)-বৃন্দ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁরা কীভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আহলে বাইত (রা.)-কে সালাত-সালাম জানাবেন।

সহীহ মুসলিম, কিতাব-৪, হাদীস-৮০৭:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ء وَاللَّفْظُ لَهُ ء قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

অর্থ: তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমরা কীভাবে আপনার প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করবো? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেন, তোমরা বোলো: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রীবৃন্দ এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করুন, যেমনটি আপনি পয়গাম্বর ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর আ'লের (মানে পরিবারসদস্যদের) প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রীবৃন্দ এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি বরকত/আশীর্বাদ দান করুন, যেভাবে আপনি পয়গাম্বর ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর পরিবারসদস্যদেরকে বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।"

মন্তব্য: এর পূর্ববর্তী বর্ণনায় যদিও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে তাঁর এবং তাঁর পরিবারসদস্যদের প্রতি সালাত-সালাম ও বরকত পাঠাতে হয়, কিন্তু এখানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিবালোকের মতো স্পষ্ট আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে তাঁর স্ত্রীমণ্ডলী (রা.) এবং তাঁর বংশধরবৃন্দ (রা.) সম্মিলিতভাবে তাঁর পরিবার গঠন করেন, যা ব্যক্ত করতেই 'আহলুল বাইত' শব্দটি হাদীসসমূহে ব্যবহার করা হয়েছে।

অপযুক্তি-৫

(আল-কুর'আন ৩৩/৩৩ প্রসঙ্গে) আরবী 'ইন্নামা' (إِنَّمَا) শব্দটি (অর্থাৎ, সত্যি অথবা শুধুমাত্র) অনন্য পার্থক্য জ্ঞাপন করে। এই অনন্য পার্থক্যের ওপর জোর দিতে 'ইউযহিবা' (يُذْهِبَ) তথা 'দূরীভূতকরণ' ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় কর্ম 'আনকুম' (তোমাদের থেকে - عَنكُمُ) শব্দটিকে প্রথম কর্ম

'রিজস্' (رِّجْسَ) তথা 'অপবিত্রতা' শব্দের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো জোর দেয়ার জন্যে 'আহলুল বাইত' (أَهْلَ ٱلْبَيْتِ) শব্দটিকে 'আনকুম' (তোমাদের থেকে) সর্বনামের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো বাক্যাংশের ব্যাকরণগত কাঠামো ইঙ্গিত করে যে এটা একটা অনন্য বিশেষত্ব বা পার্থক্য যা শুধুমাত্র আহলে বাইতকে দেয়া হয়েছে, অন্য সকলকে এ থেকে বাদ দিয়ে।

অতএব, দাবি এ মর্মে উত্থাপিত হয়েছে যে "ইন্নামা" শব্দটি শুধুমাত্র আহলে বাইতের (রা.) বেলাতেই আল্লাহর পরিশুদ্ধির ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করেছে। তাই আল্লাহ যাঁদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান তাঁরা হলেন আহলে বাইত (রা.)। শিয়াবর্গ যুক্তি দেখায় যে আয়াতটি যদি কেবলমাত্র প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদেরই সম্বোধন করে থাকে, তাহলে 'আহলে কিসা'ও কীভাবে পরিশুদ্ধ হলো? কেননা 'ইন্নামা' শব্দটি "সীমিতকারক," আর তাই এটা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকে শুধুমাত্র নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের পবিত্রকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

জবাব

এটা শিয়াদের দ্বারা প্রায়শই পুনরাবৃত্ত অপযুক্তি; তাই আমরা এই বিষয়টি আরো ভালো এবং পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্যে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। ব্যাখ্যা শুরু করার আগে সম্পূর্ণ আয়াতটি (কুর'আন ৩৩:৩৩) উদ্ধৃত করা যাক:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلاَةَ وَآتِينَ ٱلزَّكَـاةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيـراً.

অর্থ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমনটি পূর্ববর্তী যুগের পর্দাহীনতা; আর নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো। হে নবীর

পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)- আল্লাহ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন (তাতহীর) করে দেবেন।[৩১]

প্রত্যুত্তর-১

শিয়া গোষ্ঠী অপযুক্তি দেখায় যে (ওপরের আয়াতের) দ্বিতীয় অংশটি একটি পৃথক আয়াত যা এর আগে বা পরে যা আছে তার সাথে যুক্ত নয়; এবং এমতাবস্থায় প্রশ্ন দাঁড়ায়: এটা কি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক যুক্তি? আয়াতের দ্বিতীয় অংশ কি এটাকে ঘিরে থাকা প্রসঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে?

আমরা আয়াতে করীমার দুটো অংশকে বিভক্ত করেছি সাধারণ ফন্ট ও বোল্ড করা ফন্ট দ্বারা; আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আয়াতুল তাতহীর শীর্ষক দ্বিতীয়াংশটির সূচনা হয়েছে 'ইন্নামা' শব্দ দিয়ে এবং শেষ হয়েছে 'তাতহীরান্' শব্দ দিয়ে।

এক্ষণে আমরা প্রশ্ন করছি, কোনো স্বতন্ত্র বাক্য যা এর আগে বা পরে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত নয়, তা কি 'ইন্নামা' শব্দ দ্বারা আরম্ভ হতে পারে? আরবী ভাষায় 'ইন্নামা' (إِنَّمَا) শব্দটির 'আদত-হাসর' (أداة حصر) শীর্ষক (নির্দিষ্টকরণ) কর্মের পরিচিতি রয়েছে। এর মানে এটা সীমিত বা নির্দিষ্ট করে, অর্থকে সীমিত/নির্দিষ্ট করে।

শাস্ত্রীয় আরব ভাষাবিদ যেমন আল-ফার্রা এবং ইবনে ফারিস 'আল-বাহরুল-মুহীত' গ্রন্থে বলেছেন:

قال الفراء: ولا يكون ابتداء إلا ردا على أمر، ولا يكون ابتداء كلام. قال ابن فارس: والذي قاله الفراء صحيح وحجته: {إنما الولاء لمن أعتق}. قلت: ينبغي أن يكون الرد لأمر محقق أو مقدر، وإلا لورد عليه {إنما الأعمال بالنيات} ونحوه. من أحسن ما يستدل به أنها للحصر: قوله تعالى: {إنما

[৩১] কুর'আন, ৩৩/৩৩; নূরুল ইরফান।

يتقبل الله من المتقين لأنه لم يتقبل من أخيه. فلو كان يتقبل من غير المتقين لم يجز الرد على الأخ بذلك. ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى في المتقرب به لا في الفاعل لم يحسن ذلك. فكأنه قال: استوينا في الفعل وانحصر القبول في بعلة التقوى.

অর্থাৎ, ভাষাবিদবৃন্দ বলেন যে "ইন্নামা" একটি বাক্য শুরু করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না, যদি না এটা তার আগে যা এসেছে তার সাথে যুক্ত না হয়; এটা শুধু বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হতে পারে যদি এটা অন্য কিছুর প্রত্যুত্তরে হয়। অন্যথায়, এটা কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সরল সমগ্রতা বোঝায়।

ভাষাবিদবৃন্দের মতানুসারে এটা এ কারণে যে 'ইন্নামা' (إِنَّمَا) শব্দটি দুটি কাজ করে, যা নিম্নরূপঃ

১. মা' আন্ নাফিয়্যাহ - ما النافية; এবং

২. ইল্লাল্ ইসতিছনায়িইয়্যাহ - إلا الإستثنائية;

যেখানে "মা" (ما)-এর রয়েছে নেতিকরণের কাজ, এবং "ইল্লা" (إلا)-এর একটি ব্যতিক্রম করার কাজ রয়েছে।

নিচে একটি বাক্যের সূচনায় পূর্বের কোনো প্রসঙ্গের সাথে সংযুক্তি ছাড়াই 'ইন্নামা' শব্দটি ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলোঃ

إنما خلق الله الشمس

উচ্চারণঃ ইন্নামা খালাক্বাল্লাহুশ্ শামসা।

অনুবাদঃ আল্লাহ শুধুমাত্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন যে এই অর্থটি ভুল। কেননা আমরা সবাই বিশ্বাস করি আল্লাহ সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন ঠিক, তবে ওপরের বাক্যটি

বোঝায় আল্লাহ শুধুমাত্র সূর্যকেই সৃষ্টি করেছেন; এই কথাটি ধর্মদ্রোহিতা, কারণ আমরা জানি আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং শুধু সূর্য নয়।

কারণ আমরা আগেই বলেছি "ইন্নামা"-এর একটি সীমিতকরণের কার্য রয়েছে এবং আমাদের ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর সৃষ্টিকে শুধুমাত্র সূর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে এবং যেমনটি আমরা বলেছি "ইন্নামা" আরবী ভাষায় দুটি হাতিয়ারের কাজ করে এবং সেগুলো হলো 'মা' (ما - নেতিকরণ), এবং "ইল্লা" (إلا - ব্যতিক্রম)।

তাই আমরা যেনো এ কথা বলছিঃ

ما خلق الله إلا الشمس

উচ্চারণঃ মা খালাক্বাল্লাহু ইল্লাশ্ শামসা।

অর্থঃ আল্লাহ কখনো সৃষ্টি করেননি, সূর্য ব্যতিরেকে।

ওপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 'মা' (ما) কীভাবে নেতিকরণের কাজ করে, আর তা 'কখনো নয়' অর্থ জ্ঞাপন করে। এতে ব্যক্ত হয় আল্লাহ কখনো কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি; অতঃপর আসে অপর হাতিয়ার 'ইল্লা' (إلا) যা ব্যতিক্রম অর্থ জ্ঞাপন করে। কেননা এটা ব্যতিক্রমের কাজ করে যা দ্বারা সূর্যকে ব্যতিক্রম নির্ধারণ করে। তাই এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহতায়ালা কখনোই কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি, ব্যতিক্রম শুধু সূর্য। এ কথাটি স্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা।

এই কারণেই আমরা বেশিরভাগ বাক্যের শুরুতে "ইন্নামা" হাতিয়ারটি ব্যবহার করতে পারি না, কারণ এটা অর্থকে সীমাবদ্ধ করে এবং সম্পূর্ণতা বোঝায়, যদি না আমরা এটাকে একটা প্রসঙ্গের অংশ হিসেবে ব্যবহার করি, যেমনটি কোনো বিপথগামী মু'তাযেলীকে উত্তর দিতে গিয়ে আমরা নিচের যে উদাহরণ প্রদর্শন করি।

মুতাযিলাপন্থী বলে থাকেঃ আল্লাহ কুর'আন ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

এর কারণ হলো, তারা (মুতাযিলাপন্থী গোষ্ঠী) বিশ্বাস করে যে কুর’আনকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা চিরন্তন নয়, আর এটা মুসলমানদের ধর্মমতে একটি ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস। তাই এই ক্ষেত্রে আমরা “ইন্নামা” (إِنَّمَا) ব্যবহার করে তার উত্তর দিতে পারি, ঠিক যেভাবে এটা ব্যবহার করা হয়েছিল ওপরে। আমরা (উত্তরে) বলি:

إنما خلق الله الشمس

উচ্চারণ: ইন্নামা খালাক্বাল্লাহুশ্ শামসা।

অনুবাদ: আল্লাহ শুধুমাত্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

এই উপলক্ষে আমরা আমাদের কথা “ইন্নামা” দিয়ে শুরু করলেও এটা আর আগের মত ভ্রষ্ট ধর্মদ্রোহীমূলক অর্থ ধারণ করে না; কারণ আমরা আগেই বলেছি যে “ইন্নামা” হাতিয়ারটি ব্যবহার করা হলে এর আগে যে অর্থ বা প্রসঙ্গ এসেছিলো তার সাথে তাকে যুক্ত করতে হবে। আমাদের দ্বারা মু’তাযেলীর যুক্তির খণ্ডনের প্রেক্ষাপটে তাই এর অর্থ দাঁড়াবে:

“আল্লাহ শুধুমাত্র সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।” (ওই পথভ্রষ্টের উল্লেখিত দুটি বিষয়ের মধ্যে কেবল একটির প্রতি স্বীকৃতি এতে রয়েছে; কুর’আনও সৃষ্ট মর্মে তার দাবি এ বাক্যে নাকচ হয়েছে)

তাই মূলত আমরা তাকে বলছি, সে যা দাবি করেছে তা ভুল এবং সে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছে (কুর’আন ও সূর্য) তা থেকে আল্লাহ কেবল সূর্যকেই সৃষ্টি করেছেন এবং এভাবেই “ইন্নামা” শব্দটি তার আগে যে প্রসঙ্গ এসেছে তার সাথে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন: কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমরা একটা বাক্যের শুরুতে “ইন্নামা” ব্যবহার করতে পারি, এটাকে এর আগে যা এসেছে তার সাথে যুক্ত না হয়ে?

উত্তর: এটা ব্যবহার করা যেতে পারে যদি আমরা যে অর্থ ব্যক্ত করতে চাই তা একটা সামগ্রিক সম্পূর্ণ অর্থ হয়। যেমন:

إنما الإله الله

উচ্চারণ: ইন্নামাল্ ইলাহুল্লাহ।

অনুবাদ: আল্লাহই মা’বূদ/উপাস্য (খোদা)।

এক্ষেত্রে ‘ইন্নামা’ শব্দ (বাক্যের) শুরুতে ব্যবহার করাটা তার আগে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত করার প্রয়োজন ছাড়াই সঠিক, যেহেতু আমরা যে অর্থ ব্যক্ত করছি তা একেবারে সম্পূর্ণ- আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বূদ নেই।

কিন্তু আমরা “ইন্নামা বিলাল করীম” বা “কেবল বিলালই দয়ালু” বাক্যটি দিয়ে শুরু করতে পারি না, কারণ এটা একটা ধর্মদ্রোহী বক্তব্য যার অর্থ: “বিলাল ছাড়া কেউই দয়ালু নয়” (মানে আল্লাহ দয়ালু নন, যা ধর্মদ্রোহ)।

এখন প্রশ্ন হলো, এটা আমাদের বিষয়ের সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক? এটা কীভাবে কুর’আনের ৩৩/৩৩ আয়াতের সাথে প্রাসঙ্গিক?

শিয়াবর্গ দাবি করে যে আয়াতের দ্বিতীয় অংশটি স্বতন্ত্র এবং এটাকে ঘিরে থাকা প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত নয়। তারা যে দ্বিতীয় অংশের কথা বলছে তা “ইন্নামা” দিয়ে শুরু হয়েছে এবং “তাতহীরান” দিয়ে শেষ হয়েছে। তাই যদি এটা এভাবে শুরু হয় তাহলে “ইন্নামা”-এর কাজটি হবে সামগ্রিক অর্থে এবং এটা “মা” (নেতিবাচকতা) এবং “ইল্লা” (ব্যতিক্রম)-কে প্রতিস্থাপন করবে; আর এটা ‘আয়াতুল তাতহীরের’ অর্থকে পরিণত করবে নিম্নের বাক্যে:

ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس و التطهير عن أهل البيت

উচ্চারণ: লাইসা ইউরীদুল্লাহু ইল্লা ইযহাবা রিজসি ওয়াৎ তাতহীরা আন্ আহলি বাইতি।

অর্থ: আল্লাহ আর কিছুই ইচ্ছা করেন না শুধুমাত্র আহলে বাইত হতে অপবিত্রতা দূর করে তাদের পরিচ্ছন্ন করবেন।

এ কথার দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সীমাহীন ইচ্ছাকে অন্য সব কিছু ছেড়ে শুধুমাত্র আহলে বাইতের পরিশুদ্ধকরণে সীমিত/নির্দিষ্ট করা হয়; এ যেনো আল্লাহ অন্য কোনো কিছুই চান না, আর এটা নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ মাত্রার ধর্মদ্রোহ ও কুফর/অবিশ্বাস।

অথচ 'আয়াতুল-তাতহীর'কে যদি এর আগে এবং পরে যা আছে তার সাথে যুক্ত করা হয় (এবং এটা অবশ্যই তাই হবে), তবে তা সহজে নিম্নের অর্থে পরিণত হবে:

"হে রাসূলের স্ত্রী সকল, যদি তোমরা আমার দেয়া আদেশ পালন করো এবং আমি যা তোমাদেরকে নিষেধ করেছি তা করা থেকে বিরত থাকো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে ঠিক যেভাবে আমি তোমাদেরকে আমার আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে পবিত্র করতে চাই।"

এবং প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতগুলোর সঠিক অর্থ এবং যথাযথ উপলব্ধি মরুভূমির যে কোনো আরব ব্যক্তি এভাবেই পেতে পারেন। নতুবা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো এমন এক আয়াত যেটার আশপাশের কিছুর সাথে তার একেবারেই কোনো সম্পর্ক নেই? আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো এমন একটা আয়াত যেটা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীবৃন্দের (রা.) প্রতি নির্দিষ্ট বক্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে? আল্লাহ কি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারীদের (মানে উম্মতকে) পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছেন? কারণ শিয়াবর্গ যদি দাবি করে যে এর থেকে যা বোঝা যায় তা হলো অভ্রান্ততা, তাহলে এর মানে হলো আজ ১৪০০ বছর ধরে এ আয়াত পাঠকারী প্রত্যেক আরব ব্যক্তিই বুঝেছেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীমণ্ডলী (রা.) পুতঃপবিত্র এবং এটা শিয়া বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত। কেননা তারা দাবি করে যে তাঁর স্ত্রীবৃন্দ (রা.) কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ত এবং একেবারে মন্দ।

আমাদের এই উত্তরের শেষে আমরা এক্ষণে কিছু শীর্ষস্থানীয় শিয়া পণ্ডিত কী বলেছেন তা দেখবো:

فيكون تلخيص الكلام: ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس على هذا الحد عن أهل البيت، فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد حصل فيهم. وذلك يدل على عصمتهم ، وإذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه– كتاب التبيان للطوسي.

অর্থ: সুতরাং এর সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ 'এই প্রেক্ষাপটে' আহলে বাইত (রা.) থেকে রিজস্ (তথা অপবিত্রতা) অপসারণ ছাড়া আর কিছুই চান না; এটা প্রমাণ করে যে আ-রিজস্ তাঁদের থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যা তাঁদের নিষ্পাপ হওয়াকে প্রমাণ করে এবং এটা প্রমাণিত হলে আমরা যা চাই তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩২]

এটা দ্বিচারিতার সর্বোচ্চ মাত্রা বৈ কী! আৎ-তূসী উল্লেখ করেছেন যে এটা শুধুমাত্র এই প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ প্রসঙ্গে? আপনার সম্প্রদায়ের (মানে শিয়া গোষ্ঠীর) মতানুসারে এমন কোনো প্রসঙ্গই নেই। অতএব, মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং কথার মারপ্যাঁচ বন্ধ করুন!

আরেকজন শিয়া পণ্ডিত আমাদেরকে আৎ-তূসী এবং আৎ-তাবাতাবাঈয়ের মতো লোকদের দ্বিচারিতা প্রদর্শন করেছেন। আমরা তাঁর লেখনীতে পাঠ করি:

ويظهر من كلام العلماء الأبرار (رضوان الله عليهم): أن الإرادة الإلهية المعبر عنها بقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ) قد تعلقت أولاً وبالذات بإذهاب الرجس، وبالتطهير ولكننا نقول:إن الظاهر هو أنها قد تعلقت أولاً وبالذات بأمر آخر، وهو نفس الأوامر والزواجر التي توجهت إلى زوجات النبي.

অর্থ: এবং ধার্মিক আলেমদের (রহ:) উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে খোদায়ী ইচ্ছাটি তাঁর এই উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে যে "আল্লাহ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান...।" এটা প্রাথমিকভাবে এবং একচেটিয়াভাবে অপবিত্রতা অপসারণ এবং পরিশুদ্ধির সাথে জড়িত; কিন্তু আমরা বলি: যেটা স্পষ্ট তা হলো, এটা প্রাথমিকভাবে এবং একচেটিয়াভাবে অন্য একটা বিষয়ের সাথে যুক্ত; এটা ওই একই আদেশ

[৩২] আৎ-তূসী কৃত কিতাবুৎ তিবইয়ান: ৮/৩৪০।

ও নিষেধাজ্ঞার সাথে যুক্ত 'যা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীমণ্ডলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে' ঘোষিত হয়েছিলো।[৩৩]

প্রত্যুত্তর-২

আসুন, এই বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করি। আমরা আয়াতের [৩৩:৩৩] আরেকটি অংশ দেখি:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ

উচ্চারণ: ইন্নামা ইউরীদুল্লাহু লি-ইউযহিবা।

অর্থ: আল্লাহ তো এটাই চান যে দূরীভূত করে দেবেন।

এখানে আমাদের সামনে রয়েছে "জন্যে" শব্দটি যা আরবীতে "লাম" (ل) অক্ষর এবং যা আমরা বোল্ড ফন্টে "লি-ইউযহিব" বাক্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি; এই 'লি' (لِ) অক্ষর যেটা "ইউযহিব" (অপসারণ) শব্দের আগে বসেছে, সেটার এমন একটা কাজ আছে যা মু'মিন মুসলমানদের মায়েদের প্রতি নির্দেশিত আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার সাথে অপবিত্রতা অপসারণকে সংযুক্ত করে। আরবীতে একে لام التعليلية তথা "লা'ম আৎ-তা'লীলীয়াহ" বলা হয়; এর কাজ (ফলশ্রুতিমূলক/পরিণতিসূচক), তাই "লি" দ্বারা ফলশ্রুতি/পরিণতি বোঝায়।

বাক্যে ব্যবহৃত "লি" (لِ)-এর একটি উদাহরণ হলো:

جئت لأزورك

উচ্চারণ: জি'তু লি-আযূরাকা।

অর্থ: আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি।

[৩৩] জা'ফর মুরতাদা আল-আমিলী প্রণীত 'আহলুল বাইত ফী আয়াতিৎ-তাতহীর, পৃষ্ঠা ৬৬।

অতএব, এতে ফলশ্রুতি/পরিণতি বোঝায়, যেনো আপনি প্রশ্ন করছেন, "আমি কেন এসেছি?" আর উত্তর হলো, "আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি।"

এবং ঠিক যেমনটি "ইন্নামা" (إِنَّمَا) শব্দটি "মা" (مَا) এবং "ইল্লা" (إِلَّا)-এর কাজকে (নিজের মধ্যে) ধারণ করে, তেমনি "লা'ম আৎ-তা'লীলীয়াহ"-ও "কায়" (كَي)-এর কাজকে (নিজের মধ্যে) ধারণ করে, তাই এটাকে "লাম কায়" [لام كي] বলা যেতে পারে।

এ যেনো আপনি বলছেন:

جئت كي أزورك

উচ্চারণ: জি'তু কায় আযূরাক।

অর্থ: আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি।

এবং লক্ষ্য করুন, আপনি "লাম" অথবা "কায়" ব্যবহার করুন না কেন, ওগুলোর অনুবাদ একই থাকবে, কেননা দুটোর হুবহু একই উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

সুতরাং "আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি" মর্মে ওপরের বাক্যটিতে আমার আসার ফলশ্রুতি/পরিণতি হলো আপনার সাক্ষাৎ লাভ।

আমাদের আলোচ্য কুর'আনী আয়াত-

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ.

"আল্লাহ শুধুমাত্র অপসারণ করতে ইচ্ছুক।" [৩৩/৩৩]

আয়াতে উল্লেখিত 'লি' (لِ) শব্দটি বোঝায় ফলশ্রুতি/পরিণতি। অতএব, আল্লাহ কর্তৃক অপবিত্রতা অপসারণের বিষয়টি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীমণ্ডলীর (রা.) দ্বারা "নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো," "বে-পর্দা থেকো না" (৩৩/৩৩) ইত্যাদি ঐশী আদেশ-

নিষেধের সাথে জড়িত বা যুক্ত। অপবিত্রতার অপসারণ হলো তাঁদের দ্বারা খোদায়ী আদেশ-নিষেধ যা আয়াতটির সূচনায় এসেছে তা মান্য করারই ফলশ্রুতি। আর এভাবেই 'লি' (لِ) শব্দটি তার আগে আগত বিষয়ের সাথে অর্থকে জড়িত করেছে।

নতুবা আল্লাহ এমন একটি হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারতেন যা আশপাশের প্রেক্ষাপটের সাথে অর্থকে বাঁধে বা যুক্ত করে না; যেমন তিনি "আন" (أن) ব্যবহার করতে পারতেন। এটা ব্যক্ত করবে:

إنما يريد الله أن يذهب

উচ্চারণ: ইন্নামা ইউরীদুল্লাহু আন্ ইউযহিব।

অর্থ: আল্লাহ শুধুমাত্র অপসারণ করতে চান।

তাহলে দুটো অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো, "আন"-এর আগে যা আছে তার সাথে এটা অর্থকে বাঁধে না বা যুক্ত করে না; অথচ "লি"-এর অর্থ হলো ফলশ্রুতি যেমনটি আমরা বলেছি এবং তা আপনাআপনি এর আগের প্রসঙ্গটির সাথে অর্থকে যুক্ত করে। আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে "লি" ব্যবহার করেছেন, কেননা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীমণ্ডলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ খোদায়ী আদেশ ও নিষেধের সাথে আয়াতুৎ-তাতহীর যুক্ত এবং এরই ফলস্বরূপ তাঁরা পুতঃপবিত্র হয়েছেন।

যদিও "আন"(أن) এবং "লি" (لِ) অনুবাদের ক্ষেত্রে একই অর্থবোধক হবে, তবু অনারবদের কাছে প্রকাশ করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এ দুটো শব্দ আরবদের কাছে স্পষ্টভাবে পৃথক। "লি" (لِ)-কে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বন্ধনীর মধ্যে "[এই]" লিখতে পারি, যার দরুন আয়াতটির অনুবাদ হবে:

"আল্লাহ কেবল "[এই]"- চান যে তোমাদের সকল অপবিত্রতা দূর করবেন। [কুর'আন, ৩৩/৩৩]

এখানে সংযোজিত '[এই]' শব্দটি সেই সব বিষয়কে বোঝায় যা ইতিপূর্বে মু'মিনদের মাতাদের (রা.) উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে (আয়াতে)।

সবচেয়ে শ্লেষপূর্ণ বিষয় হলো জা'ফর আল-আমিলী এবং আৎ-তাবাতাবাঈয়ের মতো শিয়া পণ্ডিত উভয়েই স্বীকার করেছেন যে [৩৩:৩৩] আয়াতের "লি" হচ্ছে "লা'ম আৎ-তা'লীলীয়াহ" (لام التعليلية) এবং এখানে আমরা তাঁদেরকে উদ্ধৃত করছি:

الطباطبائي في تفسيره (الميزان) لسورة (الإسراء) يقول : قوله تعالى: { ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً} تطلق الذرية على الأولاد بعناية كونهم صغاراً ملحقين بآبائهم ، وهي – على ما يهدي إليه السياق – منصوبة على الاختصاص ويفيد الاختصاص عناية خاصة من المتكلم به في حكمه فهو بمنزلة التعليل كقوله تعالى: { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت }. [الأحزاب: ৩৩] أي ليفعل بكم ذلك لأنكم أهل بيت النبوة.

এবং

ويقول آيتهم العظمى جعفر مرتضى العاملي في كتابه (أهل البيت في آية التطهير – ص70): واللام في «ليذهب» هي لام كي، وهي تفيد التعليل، أي أن ما بعدها يكون علة لما قبلها، كقولك: «جئت لأكرمك»؛ فمدخول اللام، وهو الإكرام، علة لما قبلها وهو المجيء. فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة هو نفس إذهاب الرجس، ليس على ما يرام لا من حيث التركيب ولا من حيث المعنى حسبما أوضحناه.

অতএব, পরিশেষে আমরা বলবো যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় অংশ [৩৩:৩৩] বা আয়াতুৎ-তাতহীর পূর্ববর্তী প্রসঙ্গ ছাড়া আপনাআপনি বহাল হতে পারে না, যদি না শিয়াবর্গ মনে করে যে আরবীয় সমাজ কোনো

প্রসঙ্গ ছাড়াই একটি পরিণতিমূলক হাতিয়ার দিয়ে তা শুরু করতে পারেন। এটার আগে তাই "ইন্নামা..তাতহীরা" শব্দগুলো একটি বিচ্ছিন্ন বন্ধনীভুক্ত শব্দগুচ্ছ গঠন করে না, বরং তা এই আয়াতেরই সাধারণ প্রেক্ষাপটের অংশবিশেষ।

প্রত্যুত্তর-৩

শিয়াবর্গ যদি এখনো তাদের ক্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যায় অটল থাকতে চায় এবং দাবি করতে থাকে যে তাতহীরের আয়াতটি তার আগের আয়াতগুলোর সাথে যুক্ত নয় এবং 'ইন্নামা' হলো সীমাবদ্ধকারক, যা আহলে বাইত (রা.) কারা তা সীমাবদ্ধ করে, আর তারা যদি এটাকে আহলে কিসা (চাদরের মানুষ), অর্থাৎ সর্ব-হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু), হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলে দাবি করতে থাকে, তাহলে তাদের এই ক্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা অনুসারে শিয়াবর্গ তাদের বাকি নয়জন (৯) ইমামকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। কারণ এমন কী তাঁরাও চাদরের অভ্যন্তরে উপস্থিত ছিলেন না। আমরা আশা করি এই উদাহরণটি দ্বারা শিয়াবর্গ বুঝতে পারবে যে তারা এক বোকাটে দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রেখেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত/দয়া ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারসদস্যবৃন্দ এবং সাহাবামণ্ডলীর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) প্রতি।

মুবাহিলার ঘটনাকে কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদের আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়ার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
আম্মা বা'আদ।

নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলের বিষয়ে নাজিল হওয়া মুবাহালাহ আয়াতটিকে[৩৪] ১২ ইমাম গোষ্ঠীভুক্ত শিয়াচক্র আহলে বাইত (রা.) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদের বাদ দেওয়ার এবং তাদের নিজেদের ইমামতির দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে। এই নিবন্ধে আমরা উক্ত আয়াতের অপব্যবহার করে শিয়াদের প্রায়শই উত্থাপিত যুক্তিগুলির উত্তর দেবো (ইন-শা-আল্লাহ)।

প্রশ্ন-১: মুবাহিলার ঘটনা কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদেরকে (রা.) তাঁর আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়?

উত্তর: মুবাহিলার ঘটনাটি প্রায়শই শিয়াদের দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দকে তাঁর আহলে বায়ত থেকে বাদ দেওয়ার দালিলিক প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারা এ ব্যাখ্যা দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছে, যেহেতু মুবাহিলার ঘটনার মধ্যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাই তাঁরা আহলে বাইত নন; কেননা যখন আয়াতটি (৩:৬১) নাযিল হয়েছিলো তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব-হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু), ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকেন এবং বলেন: হে আল্লাহ, তারা আমার পরিবার (আহলী)। এমন কী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দও পরিশুদ্ধ সত্তা ছিলেন না; কারণ মুবাহিলা

[৩৪] আল-কুর'আন ৩/৬১।

কেবল তাঁরাই গ্রহণ করতে পারতেন যাঁরা পরিশুদ্ধ ও নির্দোষ ছিলেন। (এই হলো শিয়া অপযুক্তি)

আর দুর্ভাগ্যবশত, যে সমস্ত মুসলিমের মৌলিক দ্বীনী জ্ঞান নেই, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই অপযুক্তির ধোঁকায় বোকা বা বিভ্রান্ত হয়ে আসছেন, যে যুক্তিটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তিশীল। এই ঘটনা কোনোভাবেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযওয়াজ-ই-মুতাহহারাত (তথা পরিশুদ্ধ/পুতঃপবিত্র স্ত্রীবৃন্দের) আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়ার প্রমাণ হতে পারে না; কেননা এই ঘটনা থেকে শিয়াচক্র যে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেছে তা আসলে বিষয়টির সাথে অপ্রাসঙ্গিক। পুরো ঘটনাটির মূল ভিত্তি সূরা আলে ইমরানের ৬১ নং আয়াত। এতে ঘোষিত হয়েছে,

تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ.

অর্থ: (হে রাসূল, তাদের বলে দিন) 'এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে! অতঃপর মুবাহালাহ করি। তারপর মিথ্যেবাদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত দিই।[৩৫]

এক্ষণে কেন আমরা বললাম, এই ঘটনাটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দের ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক? তা এ কারণে যে, আয়াতের কোথাও আল্লাহতায়ালা কর্তৃক নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি তাঁর আহলে বাইত (রা.)-কে ডাকার নির্দেশ প্রদানের বিষয়টি আমরা দেখতে পাইনি। আয়াতটি এ কথা বলে না, "আসুন, আমরা 'আহলু বায়তেনা, ওয়া আহলু বায়তাকুম' বলি।" কিন্তু আয়াতটি ঘোষণা করে: "নিসা'আনা ওয়া নিসাকুম।" কুর'আন মজীদ এ কথাও বলে না, "আসুন, আমরা পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদের ডাকি;" অথবা এও বলে না: "আসুন, আমরা নির্দোষদের ডাকি।" তাহলে ন্যূনতম বুদ্ধিসম্পন্ন

[৩৫] আল-কুর'আন, ৩/৬১; নূরুল ইরফান।

লোকেরা কীভাবে দাবি করতে পারেন যে যাঁদেরকে মুবাহিলার জন্য নেয়া হয়নি তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বায়ত কিংবা পুতঃপবিত্র হওয়া থেকে বাদ পড়েছেন, যখন এটা আল্লাহরই নির্ধারিত মানদণ্ড নয়?

আর যদি শিয়ারা দাবি করতো এ মর্মে, যেহেতু কুর'আন বলছে - "নিসাআনা ওয়া নিসাকুম" (আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের), সেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ তাঁর "নিসা" (নারী) হতে নন, তাহলে তা মুবাহিলার ঘটনাসম্পর্কিত আয়াতে প্রদত্ত আদেশের সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু বলে বিবেচনা করা যেতো। কিন্তু শিয়াচক্র এ কথা বলার দুঃসাহস করেনি, কারণ কুর'আনে সুরা আহযাব ৩২ নং (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ)-আয়াতে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দকে তাঁর "নিসা" (নারী) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং কুর'আন দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে যুক্তি পেশ করার পরিবর্তে শিয়া গোষ্ঠী এমন যুক্তি উত্থাপন করেছে, যা আল্লাহর নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের।" আল্লাহ এ কথা বলেননি, "তোমাদের আহলে বাইত এবং আমাদের আহলে বাইত।" আর আল্লাহ এও বলেননি, "তোমাদের অভ্রান্তদের এবং আমাদের অভ্রান্তদের।" সুতরাং এই ঘটনাটি কোনোভাবেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুতঃপবিত্র স্ত্রীবৃন্দকে তাঁর আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন-২: কেন লা'নত তথা অভিশাপ দানের ব্যাপারটি বিবাদকারীদের "পুত্র" এবং "মহিলাদের" প্রতিও প্রসারিত করা হয়েছিলো?

উত্তর: এখানে "কেবল একটাই কারণ" ছিলো (খ্রিষ্টানদের) পরিবার-সদস্যদের প্রতি লা'নত প্রসারিতকরণের। আর তা ছিলো এই কারণে, তারা বিবাদকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলো। যেহেতু আল্লাহ মানুষের মধ্যে তার সন্তান এবং পরিবারের প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান রেখেছেন, তাই সে তাদের বাঁচানোর জন্য নিজেকে বিপদে ফেলে, তাদের নিরাপদ রাখার জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও ঝাঁপ দেয়। এই কারণেই

আল্লাহ তাদের পরিবার-সদস্যদের প্রতি অভিশাপ প্রসারিত করেছিলেন, যাতে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা যায়; এতে যারা মিথ্যার উপর ছিলো, তারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দুঃসাহস দেখাবে না।

যদি এমন হতো যে অভিশাপ শুধুমাত্র বিতর্ককারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে যারা মিথ্যার উপর ছিলো তারাও মুবাহিলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দুঃসাহস দেখাতো। কিন্তু এটা ছিলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর হিকমত, তাই তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বিবাদকারীদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিও অভিশাপ প্রসারিত করেছিলেন। এভাবে যারা মিথ্যার উপর ছিলো তাদের পক্ষে মুবাহিলা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর শেষ পর্যন্ত এটাই ঘটেছিলো।

অতএব, বিবাদকারী (খ্রীষ্টান) পরিবার-সদস্যদের প্রতি লা'নত প্রসারিত হওয়ার পেছনের কারণ ছিলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মিথ্যাকে তা থেকে পৃথক করা। যারা মিথ্যার উপর ছিলো তারা তাদের পরিবার নিয়ে আসার দুঃসাহস পেতো না।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নবীয়ে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে যাঁদেরকে মুবাহিলার জন্য নেয়া হয়েছিলো, তা তাঁর সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণেই হয়েছিলো। এ বিষয়ে লোকেরা অন্যান্য যে যুক্তিগুলো পেশ করেছে তা ভুল। তাঁরা মা'সূম তথা নিস্পাপ ছিলেন না, কিংবা সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চস্তরেরও ছিলেন না, অথবা এমনও ছিলেন না যে কেবল তাঁরাই মুবাহিলায় নেয়ার যোগ্য ছিলেন, এগুলোর সবই জ্ঞানহীন অনুমান। তাঁদের শুধুমাত্র নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে নেয়া হয়েছিলো। আর আমরা সহীহ হাদীস থেকে এটা জানতে পারি, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব-হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু), ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এমন সময় একত্রিত করেছিলেন যখন আয়াত (৩/৬১) অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং তিনি বলেছিলেন, "তারা আমার পরিবার" (সহীহ মুসলিম)। এটা ইঙ্গিত করে যে তাঁরা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে তাঁদের নেয়া হয়েছিলো।

প্রশ্ন-৩: মুবাহিলার জন্য "সমগ্র/গোটা" আহলে বাইত (রা.)-কে ডাকা কি বাধ্যতামূলক ছিলো?

উত্তর: যেহেতু আমরা প্রমাণ করেছি (প্রশ্ন: ১-এ) যে কুর'আনে বিশেষভাবে "আহলে বায়ত" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি বা "মুবাহিলার জন্য উভয় পক্ষের সমগ্র/গোটা আহলে বায়ত" আনার কথা বলা হয়নি, তাই এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে আহলে বাইত হতে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর স্ত্রীবৃন্দকে বাদ দেয়া স্রেফ বোকামি। এইভাবে শিয়া গোষ্ঠী এই সমস্যাটি কুর'আন থেকে সমাধানের পরিবর্তে নিজেদের দাবি প্রমাণ করার জন্য আহাদীসের শরণাপন্ন হয় এবং সেগুলোর প্রতি তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে থাকে।

আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাবলী হতে শিয়াচক্র যে সহীহ হাদীসখানা উদ্ধৃত করে তা সহীহ মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৩৬] এতে বিবৃত হয়:

وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي.

অর্থ: যখন (কুর'আনের নিম্নলিখিত ৩/৬১) আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো - "এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে," তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ডেকে বললেন, "হে আল্লাহ, এরা আমার পরিবার-পরিজন।"

শিয়া গোষ্ঠী বলে, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দের কাউকেই সাথে নেননি এবং অন্যদিকে সর্ব-হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু), ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হুসাইন (রা.)-কে একত্র করে বলেন, 'হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার-পরিজন (আহলী)', সুতরাং এ থেকে

[৩৬] বই-৩১, হাদীস নম্বর ৫৯১৫।

প্রমাণিত হয় যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন।

কিন্তু তারা যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে না তা হলো, কুর'আনের আয়াতে "আহলে বাইত" শব্দটি তাঁদের জন্য ব্যবহার করা হয়নি যাঁদের ডাকা হয়েছে এবং উভয় পক্ষের "সমগ্র/গোটা আহলে বাইত"-কে এতে উপস্থিত থাকতে হবে মর্মে এমন শর্তও আরোপ করা হয়নি। কারণ খ্রিষ্টানবর্গ যারা মুবাহিলায় প্রতিপক্ষ ছিলো, তারা তাদের 'আহল' তথা পরিবারবর্গকে সঙ্গে আনেনি। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে "কোনো নারী"-ই ছিলো না।

ফাতহুল বারী[৩৭] গ্রন্থে বলা হয়েছে: "নাজরান বেশ বড় এক এলাকা। এটা ইয়েমেনের দিকে মক্কার দক্ষিণে সাত ভাগে সফরের দূরত্বে ছিলো। এতে ৭৩টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে পৌঁছুতে কোনো দ্রুতগতির ঘোড় সওয়ারীর একদিন লেগে যেতো... প্রতিনিধিদলে ষাট জন "পুরুষ" ছিলো। তাদের মধ্যে চব্বিশ জন ছিলো সম্ভ্রান্ত পরিবারের। চব্বিশ জনের মধ্যে তিনজন এক সময় নাজরানের নেতা ছিলো।" [ফাতহুল বারী, ৮/৯৪]

যে সকল খ্রিষ্টান এসেছিলো তারা সংখ্যায় ছিলো ৬০ জন "পুরুষ"; অতএব, তাদের মধ্যে কোনো নারী ছিলো না। আর খ্রিষ্টানদের পক্ষে ফিরে গিয়ে তাদের সমস্ত পরিবারকে সাথে নিয়ে যথাসময়ে ফিরে আসা অসম্ভব ছিলো; বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেয়েছিলেন মুবাহালা ঠিক তখনই সেখানে অনুষ্ঠিত হোক, কিন্তু তারা তা একদিন স্থগিত করতে বলে (যেমনটি কিছু বর্ণনায় উল্লেখিত আছে)। এইভাবে তাদের পক্ষে নাজরানে ফিরে যাওয়া, তারপর তাদের পরিবারকে সাথে নিয়ে একদিনের মধ্যে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। কেননা নাজরানে ফিরে যেতে এক দিন সময় লাগতো, তারপর পরিবারকে সাথে নিয়ে ফিরে আসতে দু'দিন সময় লাগতো। কারণ পরিবারকে সাথে নিয়ে যাত্রা তাদের চলার গতিকে কমিয়ে দিতো। এমন পরিস্থিতিতে ঠিক পরের দিনই কীভাবে তারা মুবাহিলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হতো?

[৩৭] লেখক: ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

এ থেকে বোঝা যায় যে, মুবাহিলার জন্য বিবাদকারীদের গোটা পরিবারের উপস্থিত থাকাটা আবশ্যক ছিলো না। আর যাঁদেরকে মুবাহিলার জন্য নেয়া হয়েছিল তাঁরা ছিলেন বিরোধীদের সামনে নিজেদের দাবির গাম্ভীর্য ও সত্যতা তুলে ধরার জন্য একটি উদাহরণ।

তাছাড়া, ইমাম আহমদ (রহমহতুল্লাহি আলাইহি)-এর একটি সহীহ বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রিষ্টানদের পরিবারগুলো সেখানে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিতে অভিশাপে অন্তর্ভুক্ত করা যেতো, যা ইঙ্গিত করে যে গোটা পরিবারের উপস্থিতি অপরিহার্য ছিলো না।

قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. الراوي: عبدالله بن عباس التخريج : أخرجه الترمذي (٣٣٤٨) مختصراً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٠٦١) باختلاف يسير، وأحمد (٥٢٢٢) واللفظ له[৩৮]

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আবূ জাহেল (আল্লাহর লা'নত তার প্রতি) বলেছিলো, 'আমি যদি মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘরের কাছে নামায পড়তে দেখি, তাহলে তার গলা পায়ে চেপে ধরবো'।" বর্ণনাকারী সাহাবী (আরো) বলেন, "প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'সে এ চেষ্টা করলে ফেরেশতাকুল অবশ্যই তাকে প্রকাশ্যে পাকড়াও করবে। ইহুদী জাতিগোষ্ঠী যদি মৃত্যু চাইতো, তাহলে তাদের মরণ হতো এবং তারা জাহান্নামের আগুনে নিজেদের আসন দেখতে পেতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাথে যারা মুবাহালা করতে

[৩৮] উৎসের লিঙ্ক: https://www.dorar.net/hadith/sharh/120689

চেয়েছিলো তারা যদি তা করতো, তাহলে বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা দেখতে পেতো তাদের সম্পদ-সম্পত্তি ও পরিবার সবই হারিয়েছে'।"[৩৯]

ব্যাখ্যা:

لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً.

অর্থ: নাজরানের খ্রীষ্টানবর্গ বাড়ি ফিরে মালামাল/সম্পত্তি বা আহল তথা পরিবার-পরিজনের দেখা পেতো না - কথাটি ইঙ্গিত করে যে তাদের সমগ্র আহল/পরিবারসদস্য মুবাহালার স্থানে উপস্থিত ছিলো না। এর মানে ওই খ্রীষ্টানবর্গ নাজরানে ফিরে গেলেও পরিবারের সাক্ষাৎ পেতো না যারা তখনো নাজরানে অবস্থান করছিলো।

সুতরাং এই বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, মুবাহালায় বিবাদকারীদের সমগ্র/গোটা আহলে বাইত, সমস্ত সন্তান-সন্ততি, সমস্ত নারীর উপস্থিতিটা শর্তাধীন ছিলো না; অথচ তাদের উপস্থিতি না থাকলেও তারা অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হতো। খ্রিষ্টানবর্গ মুবাহালা করলে ফিরে যেয়ে দেখতে পেতো যে তারা সবকিছু (তাদের সম্পদ, পরিবার ইত্যাদি) হারিয়ে ফেলেছে, এমন কী তাদের পরিবারবর্গ মুবাহালা স্থানে উপস্থিত না থাকলেও তাই ঘটতো।

অনুরূপভাবে, আমরা বলতে পারি যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর "নিসা (নারী)"-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর পবিত্র স্ত্রী (রা.)-বৃন্দকে উপস্থিত থাকতে হতো না; এবং যেহেতু তাঁরা তাঁর নিসা (নারী)-এর অন্তর্ভুক্ত (কুর'আন ৩৩/৩২) অথচ মুবাহিলায় উপস্থিত ছিলেন না, সেহেতু তাঁদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়বেন না।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উভয় পক্ষের গোটা আহলে বাইতের সেখানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক ছিলো না। তাই নবী পাক (সাল্লাল্লাহু

[৩৯] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ২২২৫।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দকে তাঁরই আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে শিয়াদের এই অপযুক্তিটিও ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন-৪: (এতে) এটা কি বোঝায় না যে সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-ই "শুধুমাত্র" আহলে বাইত-এর অন্তর্গত? কেননা মুবাহিলার ঘটনায় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে ডেকে বলেছিলেন, 'এরা আমার পরিবার-পরিজন (আহল)?'

উত্তর: না, এটা বর্ণনাটাকে ভুলভাবে বোঝা ছাড়া কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুবাহিলার ঘটনায় সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ডেকে বলেন, "এরা আমার পরিবার (আহল)।" তিনি এ কথা বলেননি, "শুধু এরাই আমার আহলে বাইত।"

তাছাড়া, আমাদের যদি এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হতেই হয়, তবে আসুন, আমরা আরো কিছু উদাহরণ সামনে নিয়ে আসি এবং সেগুলোর প্রতি অনুরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করি।

উদাহরণ-১: (হযরত আয়েশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)'এর প্রতি ইফক্ তথা মিথ্যে কুৎসা রটনার (حادثة الإفك) সময় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ স্ত্রীকে 'আহলে বাইত' হিসেবে ডেকেছিলেন।

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ، قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي.

অর্থ: হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ওই ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যে আমার স্ত্রীর (আহলে বাইতের -أَهْلِ بَيْتِي) ব্যাপারে মিথ্যে কুৎসা রটনা দ্বারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী (আহল) সম্পর্কে ভালোই জানতে পেরেছি। এবং তারা (মানে কুৎসা রটনাকারীরা) এমন

এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া কিছুই জানিনা। সে কখনো আমাকে ছাড়া আমার ঘরে আসেনি।[৪০]

উদাহরণ-২: প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহীহ মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ অপর এক হাদীসে তাঁর পবিত্র স্ত্রী (রা.)-বৃন্দকে 'আহলে বাইত' বলে সম্বোধন করেছেন।

قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ۱ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ۱فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ.

অর্থ: আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি জয়নাব (রা.)'এর বিবাহের ভোজও দেখেছি; এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মাঝে রুটি ও গোশত পরিবেশন করেন এবং তাঁদেরকে তাঁদের মনের তৃপ্তি অনুযায়ী খেতে দেন; আর তিনি (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে মানুষদের ডাকতে পাঠান; অতঃপর তিনি (অনুষ্ঠান থেকে) মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করি। দুই ব্যক্তি বিয়ের স্থানে অবশিষ্ট ছিলো এবং তারা কথা বলতে ব্যস্ত ছিলো এবং (হুজরাহ/কক্ষ থেকে) বের হয়নি। এরপর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দের (কক্ষের) দিকে অগ্রসর হন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে আস-সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিয়ে বলেন: "পরিবারের সদস্যরা (আহলে বাইত), কেমন আছো?" তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমরা ভালো আছি; আপনি আপনার পরিবারকে কী অবস্থায় (দেখতে) পাচ্ছেন?" তিনি বলেন, "ভালো অবস্থায়।"[৪১]

[৪০] সহীহ বুখারী, ৪৭৫০; ই,ফা,বা, নং ৪৩৯১।

[৪১] সহীহ মুসলিম বই-১৬, হাদীস নম্বর- ১০৩।

ব্যাখ্যা:

এখন যদি আমরা এই উদাহরণগুলোর প্রতি অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করি যা শিয়ারা মুবাহিলার বর্ণনায় প্রয়োগ করেছে, তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে শুধুমাত্র প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দই আহলে বাইত, কারণ এই উদাহরণগুলোতেও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য কোনো সদস্যকে আহলে বাইত হতে আগত বলে উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু এই স্ত্রীকে (মানে হযরত আয়েশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'কে) "আমার পরিবার" (আহলি বায়তী) বলে সম্বোধন করেছিলেন।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা জানি যে এটা ভুল ব্যাখ্যা। না আহলে সুন্নাহ এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হবেন, না কোনো নিরপেক্ষ পাঠকও এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হবেন। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি আহলে বাইত থেকে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর পরিবারকে বাদ দেয়ার জন্য এই উদাহরণগুলো নিয়ে শিয়াদের কাছে যান, তাহলে শিয়াচক্র অবশ্যই তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করবে। একইভাবে, আমরাও তাই করি যখন এই শিয়া গোষ্ঠী সুন্নীদের কাছে মুবাহিলার বর্ণনাসহ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দকে আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়ার প্রমাণ হিসেবে হাজির হয়।

যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময়ে "আহলে বায়ত" শব্দটি দিয়ে লোকদের সম্বোধন করেছেন, তখন এটা আহলে বাইত থেকে এমন অন্যদের বাদ দেয়নি যাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। কেননা এটা বোঝা খুব সহজ যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই কোনো দলকে আহলে বাইত শব্দটি দ্বারা সম্বোধন করেছিলেন, তখন "শুধুমাত্র তাঁরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন," আর বাকিরা সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না।

আর এসব বর্ণনা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। সুতরাং এগুলো থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুতঃপবিত্র স্ত্রী (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহুন্না)-বৃন্দ সবাই আহলে বায়ত। কুর'আনের আয়াতে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে মানুষকে "মাটি" থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে মানুষকে "পানি" থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা যেমন এই আয়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মানুষ মাটির পাশাপাশি পানি থেকে সৃষ্ট হয়েছে, যদিও এই দুটি বিষয় আলাদা আলাদা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এখানেও আমরা মুবাহিলার ঘটনা ও ইফকের ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনাসংক্রান্ত বিভিন্ন সহীহ বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীমণ্ডলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্না) ও সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সবাই আহলে বাইত-এরই সম্মানিত সদস্য।

প্রশ্ন-৫: সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে কি মুবাহিলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো এই কারণে যে তাঁরা নিষ্পাপ/পরিশুদ্ধ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধার্মিকতায় শ্রেষ্ঠতম গুণসম্পন্ন ছিলেন?

উত্তর: এই কারণটি হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কুরআনে তা উল্লেখ করতেন। আল্লাহ অবশ্যই উভয় দলকে বলতেন, "তোমাদের মধ্যে যারা নিষ্পাপ/পরিশুদ্ধ তাদেরকে ডাকো;" অথবা আল্লাহ বলতেন, "তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি ধার্মিক ও নেককার তাদেরকে ডাকো।" কিন্তু আল্লাহ শুধু উভয় পক্ষকে বলেছেন, "তোমাদের ছেলেদের, তোমাদের নারীদের এবং নিজেদেরকে ডেকে আনো।"

এমন কী প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে একত্রিত করে বলতেন না এ কথা, "তারা আমার পরিবার-পরিজন" (সহীহ মুসলিম)। তিনি (বরঞ্চ) বলতেন, "তারাই মা'সূম/অভ্রান্ত।" অথবা বলতেন, "তারা সবচেয়ে গুণী ব্যক্তিত্ব।" কিন্তু তেমন কিছু তো বর্ণিতই হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে বিবাদকারীদের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে হিকমত তথা প্রজ্ঞা এই কারণ ছিলো না যে তারা নির্দোষ/নিষ্পাপ ছিল বা তারা সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ছিলো, বরং এর "একমাত্র" কারণ

ছিলো এই যে, তারাই বিবাদকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে ছিলো আবদ্ধ। আর এই কারণটি সমর্থিতও বটে, যদি আমরা এ শর্তটির দিকে তাকাই যে, "শুধুমাত্র একটি পক্ষের পরিবার-সদস্যদেরই অন্তর্ভুক্ত করা নয়, বরং উভয় পক্ষের পরিবার-সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" আর এটা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে খ্রীষ্টান বিবাদকারীবর্গ এমন কী তাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও পরিশুদ্ধ/অভ্রান্ত মনে করতো।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে মুবাহিলায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণ এই নয় যে তাঁরা নিষ্পাপ/পরিশুদ্ধ ছিলেন, অথবা এও নয় যে তাঁরা ছিলেন তৎকালীন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে সবচেয়ে ধার্মিক। কিন্তু এটা ছিলো স্রেফ এই কারণে যে তাঁরা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে সম্পর্কিত ছিলেন, যাতে খ্রিষ্টানদের সামনে প্রমাণ করা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রিয় পরিবার-সদস্যবৃন্দের (ক্ষতির) ঝুঁকি নিতে পারেন না, যদি না তিনি তাঁর দাবিতে সত্যবাদী হন।

নোট: এর দ্বারা আমরা কোনোভাবেই এ কথা প্রমাণ করতে চাই না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সকল পবিত্র আহলে বাইত-সদস্য ধার্মিক ছিলেন না, কিংবা তাঁদের কোনো গুণগত মাহাত্ম্যই ছিলো না (আল্লাহ মাফ করুন)! আমরা তাঁদেরকে ইসলামের অত্যন্ত মহৎ, গুণী ও ধার্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করি। কিন্তু আমাদের কাছে এমনও সহীহ হাদীস/রওয়ায়াত রয়েছে যে, সেই সময়কালে মুসলিম সম্প্রদায়ে এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা অপেক্ষাকৃত উন্নততর গুণগত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। অতএব, যদি মাপকাঠি হতো মুসলিম সম্প্রদায়ের গুণী ব্যক্তিত্ববৃন্দকে (সামনে) আনা, তাহলে অবশ্যই অন্য কোনো সদস্যকেও আনা হতো। কিন্তু যেহেতু এটা কোনো শর্ত ছিলো না, তাই তাঁদের আনা হয়নি। এমন কী তাঁদের না ডাকাও প্রমাণ করে যে সর্বাধিক গুণী ব্যক্তিদের ডাকা শর্ত ছিলো না। দেখুন হাদীস - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.

আমরা এ কথা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর (যাহেরী) হায়াতে জিন্দেগীতে বলতাম: "প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পরে এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই এ কথাকে নিষেধ করেননি।[৪২]

হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) থেকেও এর স্বপক্ষে বর্ণনা এসেছে। তাঁর কাছ থেকে সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন:

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث.

অর্থ: প্রিয়নবী (দ)'এর পরে এই উম্মতের মাঝে সেরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা); অতঃপর সেরা হলেন হযরত উমর (রা); আর আমি যদি চাইতাম, তবে তৃতীয় জনের (নাম) উল্লেখ করতাম।[৪৩]

প্রশ্ন-৬: মুবাহিলা গ্রহণের জন্য কি মা'সূম/অভ্রান্ত অথবা পরিশুদ্ধ হওয়া শর্ত ছিলো?

---

[৪২] আল-বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'মানা'ক্বিব, ৩৪৬৮; সুনানে আবী দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), কিতা'বুস্ সুন্নাহ, ৪৬২৭, ৪৬২৮, ৪৬২৯; ইবনে মাজাহ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ), 'মোক্বাদ্দমা', ১০৬; সুনানে তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'মানা'ক্বিব', ৩৭০৭ এবং ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ১:১১৪; ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৪৩] ইমাম ইবনে ক্বুদামা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'লুম'আতুল ই'তিক্বাদ', ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা, বাংলা সংস্করণ, ২০২১ খ্রীঃ।

উত্তর: শিয়াচক্র এমন একটি চিত্র এঁকে থাকে যেনো মুবাহিলা শুধুমাত্র তাঁরাই করতে পারতেন যাঁরা মা'সূম/অভ্রান্ত ছিলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে গ্রহণ করেছিলেন কারণ তাঁরা নিষ্পাপ/অভ্রান্ত ছিলেন। এ কারণেই বাকিদের নেয়া হয়নি। এই অভিমত সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যে। তাই যদি কারণ হতো, তাহলে কোনো মুসলমানকেই মুবাহিলা গ্রহণের অনুমতি দেয়া যেতো না। কেননা শিয়াদের মতানুযায়ী, মাত্র ১৪ জনই মা'সূম/অভ্রান্ত ছিলেন এবং তাঁরাই পরিশুদ্ধ ছিলেন, আর বাকি মুসলমানবৃন্দ অভ্রান্ত নন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে শিয়াদের ইমামবর্গ সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁদের বিরোধীদের সাথে মুবাহিলা করার অনুমতি দিয়েছেন, যদিও সাধারণ মুসলমানবৃন্দ মা'সূম/নির্দোষ নন।

শিয়াদের প্রণীত উসূলে কাফী পুস্তকের ২য় খণ্ডে 'পারস্পরিক অভিশাপ' পরিচ্ছেদে পাঁচটি রওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে যা নির্দেশ করে যে প্রত্যেক মু'মিন মুসলমান বিরোধীদের সাথে 'পারস্পরিক অভিশাপ' (মুবাহিলা) প্রয়োগ করতে পারবেন; এটা তিন দিনের রোজা পালনের মাধ্যমে নিজের (আধ্যাত্মিক) উন্নতি সাধন করে সম্ভব হবে। এর আদেশ হচ্ছে যেমন - গোধূলির সময় তিনি তাঁর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো নিজ প্রতিপক্ষের আঙ্গুলের মধ্যে রাখবেন এবং বিশেষ দোয়া পাঠ করবেন।

নিম্নে এতদসংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হলো:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّا نُكَلِّمُ النَّاسَ فَنَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء - : ٥٩) فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِي أُمَرَاءِ السَّرَايَا فَنَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ (المائدة : ٥٥) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَ نَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى (الشورى : ٢٣) فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِي قُرْبَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً مِمَّا

حَضَرَنِي ذِكْرُهُ مِنْ هَذِهِ وَ شِبْهِهِ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ قُلْتُ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ أَصْلِحْ نَفْسَكَ ثَلَاثاً وَ أَظُنُّهُ قَالَ وَ صُمْ وَ اغْتَسِلْ وَ ابْرُزْ أَنْتَ وَ هُوَ إِلَى الْجَبَّانِ فَشَبِّكْ أَصَابِعَكَ مِنْ يَدِكَ الْيُمْنَى فِي أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَنْصِفْهُ وَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنْ كَانَ أَبُو مَسْرُوقٍ جَحَدَ حَقّاً وَ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِيماً ثُمَّ رُدَّ الدَّعْوَةَ عَلَيْهِ فَقُلْ وَ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِيماً ثُمَّ قَالَ لِي فَإِنَّكَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَرَى ذَلِكَ فِيهِ فَوَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ خَلْقاً يُجِيبُنِي إِلَيْهِ.

অর্থ: "একবার আমি সর্বোচ্চ ঐশী প্রতিশ্রুতির প্রাপক আবূ আবদুল্লাহকে বলি, 'আমরা মানুষের সাথে কথা বলি এবং আমাদের (শিয়া মুসলিম) বিশ্বাসের সমর্থনে তাদের কাছে উদ্ধৃত করি অত্যন্ত মহিমান্বিত ও পরম পবিত্র আল্লাহর বাণী: 'হে ঈমানদারবর্গ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের আর তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে (ঐশী) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত...' (৪:৫৯)। তারা বলে, 'এটা সশস্ত্র বাহিনীর মিশনের সেনাপতিবৃন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।' তারপর আমরা তাদের কাছে উদ্ধৃত করি অত্যন্ত মহিমান্বিত, পরম পবিত্র আল্লাহর বাণী: 'নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারবর্গ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহরই সামনে বিনত হয়' (৫:৫৫)। তারা বলে, 'এটা মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য।' অতঃপর আমরা তাদের কাছে উদ্ধৃত করি মহামহিম, পরম পবিত্র আল্লাহর বাণী: '(হে রাসূল), বলুন, "আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা.." (৪২:২৩)। তারা বলে, 'এটা মুসলমানদের আত্মীয়দের জন্য প্রযোজ্য।' "আমি (বর্ণনাকারী) তখন আমার জানা সমস্ত রেফারেন্স উল্লেখ করি এবং ইমাম বলেন, 'যদি এমন হয় তবে তাদেরকে আল-মুবাহালাহ (শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্যের আবেদন)-এর

প্রতি আহ্বান জানান।' তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা আমি কীভাবে করবো?' ইমাম বললেন, 'তিন দিন আপনার আত্মাকে সংশোধন করুন,' আমার মনে হয় তিনি বললেন, 'দ্রুত স্নান করে আপনি এবং সে (প্রতিপক্ষ) উভয়ে পাহাড়ে যান, তার আঙ্গুল দিয়ে আপনার ডান হাতের আঙ্গুলগুলি আড়াআড়িভাবে আবদ্ধ করুন, তারপর নিজের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের জন্য আত্মসমর্পণ করুন (নিজেকে দিয়ে শুরু করুন) এবং বলুন, "হে প্রভু, সাতটি আসমান এবং সাতটি জমিনের পালনকর্তা, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, অত্যন্ত দয়ালু ও পরম করুণাময়, যদি আবূ মাসরুক কারো অধিকার অস্বীকার করে থাকে বা মিথ্যা দাবি করে, তার উপর আসমান থেকে গযব-আযাব তথা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নাযিল করুন।" তারপর তাকে তার দিকে ফিরিয়ে বলুন, 'যদি অমুক সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে বা মিথ্যা দাবি করে থাকে তবে তার উপর আসমান থেকে গযব-আযাব বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাঠান।' অতঃপর ইমাম আমাকে বলেন, 'আপনি খুব শিগগিরই তার ক্ষেত্রে এটা দেখতে পাবেন।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এমন কোনো প্রাণি খুঁজে পাইনি, যে আল-মুবাহালাহ (শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন) আমার আহ্বানে গ্রহণ করতে পেরেছে'।"[৪৪]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُبَاهَلَةِ قَالَ تُشَبِّكُ أَصَابِعَكَ فِي أَصَابِعِهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ أَقَرَّ بِبَاطِلٍ فَأَصِبْهُ بِحُسْبَانٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكَ وَ تُلَاعِنُهُ سَبْعِينَ مَرَّةً.

অর্থ: "আপনার হাতের আঙ্গুলগুলিকে তার আঙ্গুলগুলি দিয়ে আড়াআড়িভাবে স্থাপন করুন এবং বলুন, 'হে প্রভু, যদি কেউ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে বা মিথ্যা বলে থাকে তবে তাকে আসমান থেকে গযব-আযাব অথবা আপনার তরফ থেকে শাস্তি দিন', এবং তারপর একে অপরকে সত্তুর বার অস্বীকার করুন।"[৪৫]

---

[৪৪] বর্ণনাটি হাসান; মির'আত আল-উকুল, ১২তম খণ্ড, আল-মাজলিসি কর্তৃক শ্রেণিকরণ, পৃষ্ঠা-১৮৫।
[৪৫] বর্ণনাটি সহীহ; মির'আত আল-উকুল পুস্তকে আল-মাজলিসি দ্বারা মান নির্ণয়, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা- ১৮৫।

মন্তব্য:

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন কোনো শর্ত নেই এ মর্মে যে, যাঁরা পরিশুদ্ধ বা অভ্রান্ত তাঁরাই মুবাহিলা গ্রহণ করবেন। এমন কী সাধারণ মুসলমানবৃন্দও তা করতে পারেন। আর শিয়াচক্র এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে সর্ব-হযরত সালমান আল ফারসী, আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'এর মতো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবা-মণ্ডলী সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের (মানে সাধারণ মুসলমানদের) যদি মুবাহিলা করার অনুমতি দেয়া যায়, তাহলে কেন ওই সাহাবী (রা.)-দের এতে নেয়া হলো না? আমরা এই প্রশ্নের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উত্তর পেতে পারি আর তা হলো, এতে এমন শর্ত ছিলো না যে অভ্রান্ত ব্যক্তিদেরই মুবাহিলা গ্রহণ করা উচিত। আর সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে মুবাহিলার জন্য নেয়ার কারণও এটা ছিলো না।

এমন কী শিয়া ভাষ্যকারও একই ব্যাখ্যা করেছেন: 'পারস্পরিক অভিশাপ' /মুবাহিলাহ/ সেই সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছু (শরঈ) হাদীস নির্দেশ করে যে প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমান চাইলে তা প্রয়োগ করতে পারেন।[৪৬]

অতএব, শিয়া পণ্ডিতদের মতে মুবাহেলা সেই সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; তাই যদি অভ্রান্ত হওয়া সেই সময়ের জন্য প্রয়োজনই হতো, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদেরকে মুবাহেলা করার অনুমতি দেয়া হলো কীভাবে? এতে পরিস্ফুট হয় যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ যাঁদেরকে কুর'আন স্পষ্টভাবে আহলে বাইত হিসেবে ঘোষণা করেছে, তাঁদেরকে আহলে বাইত থেকে বাদ দেয়াটা কেবল শিয়াদের দ্বারা তৈরিকৃত একটি ধারণা ছিলো।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা যা শিয়াচক্র তৈরি করে নিয়েছে এ মর্মে যে সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মা'সূম/নির্দোষ ছিলেন আর তাই তাঁদের মুবাহিলার

[৪৬] The Light of The Holy Qur'an ৩য় খণ্ড, পরিচ্ছেদ-৬, পৃষ্ঠা-১৭১, (আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ কামাল ফাগিহ ঈমানী এবং মুসলিম আলেম-উলামার একটি দল)

জন্য নেয়া হয়েছিলো। না, এটা সম্পূর্ণ ভুল, তাঁরা শুধুমাত্র নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তাঁদেরকে নেয়া হয়েছিলো, যাতে বিরোধীদের সামনে প্রমাণ করা যায় যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দাবিতে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।

প্রশ্ন-৭: কেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে মুবাহিলার জন্য নিয়েছিলেন? শুধুমাত্র তাঁরাই কি মুবাহিলায় নেয়ার যোগ্য ছিলেন?

উত্তর: আল-মুবাহালাহ অর্থ একে অপরকে অভিশাপ দেয়া। আসলে তর্কের পক্ষ একদিকে ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অন্যদিকে খ্রিষ্টানবর্গ। কিন্তু অভিশাপ প্রদানের চ্যালেঞ্জের পরিসর পুত্র ও মহিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, যাতে এটা আরো দৃঢ়ভাবে দেখায় যে দাবিদার তাঁর দাবির সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত যে তিনি একেবারে সঠিক। আল্লাহ মানুষের মধ্যে আপন সন্তান ও পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এমনভাবে স্থাপন করেছেন, সে তাদের বাঁচানোর জন্য নিজেকে বিপদে ফেলে, তাদের নিরাপদ রাখার জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ডুবে যায়। এভাবে মিথ্যাবাদীদের পুত্র, নারী ও নিজেদের সত্তাকে খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তি ঢেকে ফেলবে এবং সত্যের শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; কোনো চিহ্ন না রেখেই তাদের সমূলে উৎপাটন করা হবে। আর ঠিক এই কারণেই নারীদের আগে পুত্রের কথা বলা হয়েছে, কারণ মানুষ তার পুত্রদেরকে তার নারীর চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কেননা তারাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের থেকে পুরুষের বংশধর টিকে থাকে।

এভাবে মুবাহিলার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষভাবে তাঁর বংশধরদের এবং যাঁদের মাধ্যমে তাঁর বংশধর অস্তিত্বশীল ও বেঁচে থাকবে তাঁদেরকে নিয়েছিলেন। আর এখানে যা অনন্য ছিলো তা হলো, সাধারণ ক্ষেত্রে সমস্ত কন্যার বংশ তাদের পিতার সাথে যুক্ত, তাদের মায়ের সাথে যুক্ত নয়। কিন্তু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধরবৃন্দ তাঁদের মায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন, কারণ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধর আজ তাঁর কন্যা ফাতিমা

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এবং তাঁর দুই পুত্র সর্ব-ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মাধ্যমেই অস্তিত্বশীল ও টিকে আছে।

এইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি উদাহরণ হিসেবে সেই সদস্যদের মুবাহিলায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁদের থেকে তাঁর বংশধরবৃন্দ অস্তিত্বশীল ও টিকে থাকবেন, যাতে বিরোধীদের দৃষ্টিতে তাঁর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং বিশ্বকে (খ্রিষ্টানদের) দেখানো যায় যে তিনি তাঁর বংশধরদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন; যাতে অবিশ্বাসীরা বুঝতে পারে তিনি তাঁর বংশধরদের এই ঝুঁকিতে ভয় পান না যে, যদি তাঁদের কিছু ঘটে যায় তবে এতে তাঁর বংশের ইতি হবে। কারণ এই লোকেরা ঐতিহ্যগতভাবে বংশ এবং এর বিস্তারকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতো; কেননা তাদের মতে একজন ব্যক্তিকে তখনই স্মরণ করা হয় যখন তার বংশধর সফল হয় এবং বংশবিহীন ব্যক্তি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে (বিস্মৃতিতে) হারিয়ে যায়। সুতরাং, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুবাহালায় সত্যবাদী না হলে তাঁর অবশিষ্ট একমাত্র কন্যা ও কন্যার স্বামী এবং তাঁদের পুত্রদ্বয়-সহ উত্তরসূরীবৃন্দ অস্তিত্বশীল ও টিকে থাকা অসম্ভব ছিলো।

“নির্বংশ” (اَلْأَبْتَرُ) হওয়ার সমালোচনা দ্বারাই মক্কার মুশরিকবর্গ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আঘাত করতো। কেননা নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুত্রবৃন্দ বেসালপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; সাধারণভাবে তাঁরাই ছিলেন তাঁর বংশধর, যাঁদের মাধ্যমে খান্দান জারি থাকতো।

এই বর্ণনাগুলি থেকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি সেই যুগে বংশধরদের বেঁচে থাকার ব্যাপারটিকে কতোখানি গুরুত্ব দেয়া হতো।

সর্ব-হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং কাতাদাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সকলেই বলেন, এই আয়াতটি (১০৮/৩) আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা উল্লেখ করা হতো, তখন সে বলতো, 'তাঁর কথা বাদ দাও, কারণ তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর কোনো বংশ

নেই। তাই তিনি মারা গেলে তাঁকে স্মরণ করা হবে না।' অতঃপর আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন (আল কাওসার)।”

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আতা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “এই সূরাটি আবূ লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো যখন রাসূলুল্লাহর এক পুত্র বেসালপ্রাপ্ত হন। আবূ লাহাব মূর্তিপূজকদের কাছে গিয়ে বল্লো, 'আজ রাতে মুহাম্মাদকে (বংশধর থেকে) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।' তাই এ বিষয়ে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন, 'যে ব্যক্তি আপনাকে ঘৃণা করবে, সে বংশধর হতে বিচ্ছিন্ন অথবা নির্বংশ হয়ে যাবে।'' (আল-কুরআন, ১০৮/৩)

আস-সুদ্দী বলেন, “যখন কোনো মানুষের ছেলেরা মারা যেতো, লোকেরা বলতো, তাকে কেটে ফেলা হয়েছে। সুতরাং যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুত্রবৃন্দ বেসালপ্রাপ্ত হন, তখন তারা বলতো, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কেটে ফেলা হয়েছে।' এভাবে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, (কারণ) যে ব্যক্তি আপনাকে ঘৃণা করে, তাকে কেটে ফেলা হবে (মানে নির্বংশ হবে)।”

এমন কী খ্রিস্টানবর্গও একই সমস্যার জন্য চিন্তিত ছিলো (অর্থাৎ তাদের বংশধরদের বেঁচে থাকার বিষয়ে):

[সহীহ বুখারী ৫/৬৬৩] হুযাইফা বর্ণনা করেন: “নাজরানের দুই নেতা আল-আকিব এবং আস-সায়্যিদ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসেছিলেন (তাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী তাদের বিরুদ্ধে) অভিশাপ চাইতে এবং তাঁদের একজন অপরজনকে বলেন: 'আসুন, আমরা এটা না করি। আল্লাহর কসম, তিনি যদি সত্যিই একজন নবী হয়ে থাকেন এবং আমরা আল্লাহর কাছে অভিশাপ চাই, তাহলে আমরা এবং আমাদের বংশধর পরবর্তীকালে কখনো জারি থাকতে পারবো না'।”

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিরোধীরা তাদের বংশধর এবং তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে যত্নশীল ছিলো, কারণ এটা সেই মুহূর্তে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো।

শিয়া বর্ণনা অনুসারে এমন কী বিরোধীরাও একই ধারণা পোষণ করছিলো: তাদের নেতা আস-সায়্যিদ, আল-আকিব এবং আল-আহতাম বলেছেন: 'যদি তিনি (দ.) তাঁর উম্মত/জাতির (অর্থাৎ তাঁর সাথে সম্পর্কহীন লোকদের) সাথে আমাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়ার জন্য আসেন, তাহলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়ার প্রক্রিয়ায় জড়িত হবো। কারণ তখন তিনি কোনো নবী নন। কিন্তু যদি তিনি কেবল তাঁর আহলে বাইত তথা ঘরের লোকদের নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দানে অংশগ্রহণ করেন, তবে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিশাপ দানে অংশ নেবো না। কেননা তিনি সত্যবাদী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ঘরের লোকদের সামনে রাখবেন না' (আত-তাফসির, আল-কুম্মি)।[৪৭]

মন্তব্য: লক্ষ্য করুন, তারা এ কথা বলেনি মুসলিম উম্মাহ থেকে মুবাহিলায় আনার জন্য কারা "যোগ্য" তা দেখা যাক, কারণ এই অভিশাপটি পরিবারের সদস্যদের মাঝে প্রসারিত হওয়ার কারণ এটা (মানে যোগ্যতা) ছিলো না, বা তারা এও বলেনি দেখা যাক কারা এই উম্মাহর "সবচেয়ে ধার্মিক" ব্যক্তি বা নির্দোষ/অভ্রান্ত? কারণ এটা মুবাহিলার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড ছিলো না এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ পর্যন্ত অভিশাপ প্রক্রিয়া প্রসারিত হওয়ার কারণও ছিলো না। কেননা অভিশাপটি পরিবারের সদস্যদের মাঝে প্রসারিত করা হয়েছিলো এ কারণে যে তাঁরা মতভেদকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। সুতরাং, শিয়া গোষ্ঠী যারা মনে করে যোগ্যদেরই কেবলমাত্র মুবাহিলার জন্য নেয়া হয়েছিলো, তাদের ভুল ধারণা সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন।

আজো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধরবৃন্দ টিকে আছেন তাঁরই কন্যা হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর দুই পুত্র সর্ব-ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মাধ্যমে।

এই বর্ণনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন: আল-হাকিম (রহ.) হযরত জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন; হযরত জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: "সকল মায়ের সন্তানদের জন্য তাদের

[৪৭] তাফসীরে মীজান, তাবাতাবাই থেকে নেওয়া, আয়াত ৩:৬১-এর জন্য।

জ্ঞাতি আপন আপন পিতার কাছে ফিরে আসে, ফাতেমার পুত্রদ্বয় ব্যতিরেকে; কারণ আমি তাদের অভিভাবক এবং জ্ঞাতি।[৪৮]

আর লোকেরা হয়তো বলতে পারে যে সর্ব-হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে কেন নেয়া হয়েছিলো তা বোঝা গেল, কিন্তু হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে নেয়া হয়েছিল কেন? এর উত্তর এই বর্ণনায় রয়েছে; রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী এবং মহিমান্বিত, তিনি প্রত্যেক নবীর বংশধরকে তার মেরুদণ্ডে (সুলব্) স্থাপন করেছেন এবং তিনি আমার বংশধরকে আলী ইবনে আবি তালিবের মেরুদণ্ডে স্থাপন করেছেন"।[৪৯]

এইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যাঁদের থেকে তাঁর বংশধরবৃন্দ অস্তিত্বশীল ও টিকে থাকবেন এমনই এক দৃষ্টান্তস্বরূপ যা বিরোধীদের সামনে প্রমাণ করবে যে তিনি তাঁর দাবিতে সত্যনিষ্ঠ।

নবী (দ.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পর্কে:

উত্তর-১: এটা বলা যেতে পারে যে, সমগ্র আহলে বাইত (রা.)-কে আনা বাধ্যতামূলক নয় বিধায় আযওয়াজে মুতাহহারাত তথা পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ (রা.)-কে মুবাহিলার স্থানে নিয়ে যাওয়া না হলেও খ্রীষ্টানদের পরিবারসদস্যদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যেভাবে তাদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে পবিত্র স্ত্রীবৃন্দকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো।

[৪৮] আল- মু'জামুল কবীর, পৃষ্ঠা-১৩০ (ইহইয়াইল মায়্যিত বি-ফাযায়েল-ই-আহলে বাইত থেকে নেওয়া), শিয়া অনুবাদক সৈয়দ আতহার হোসেন এস.এইচ. রিজভী, এম.এ. (ইংরেজি), এম.এ. (ফার্সি), এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ) দ্বারা অনূদিত।

[৪৯] ইবনে হাজর আল-হাইসামী মক্কী (রহ.) কৃত আস-সাওয়াইক আল-মুহরীকাহ, অধ্যায়-১১, পরিচ্ছেদ-১, পৃষ্ঠা-২৩৯।

উত্তর-২: যদি প্রথম উত্তরটি শিয়াদের কাছে সন্তোষজনক মনে না হয় তবে এর অন্য উত্তরটি হলো, পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ (রা.) তা ছিলেন না, যাঁদের থেকে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধরবৃন্দ বিস্তার লাভ করবেন; তাই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের গ্রহণ করেননি। তিনি (সা:) তাঁদেরকেই সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যাঁদের থেকে তাঁর (দ) বংশ বিস্তার হবে। কেননা তখনকার দিনে বংশধর ও তাঁদের টিকে থাকাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হতো। সুতরাং পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ (রা.)-কে সাথে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না, কারণ তাঁরা এমন নন যাঁদের সাথে তার বংশের জারি থাকার সম্পর্ক ছিলো।

উত্তর-৩: এটাও বলা যেতে পারে যে মুবাহিলার ঘটনার সময় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদের জন্য বিশেষ আদেশ[৫০] অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো তাঁদেরকে আল্লাহর নির্দেশে তাঁদের গৃহে রেখে যান, কেননা তিনি (সা:) মনে করেছিলেন সেখানে তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে যাওয়া অনুচিত বা অপ্রয়োজনীয় ছিলো।

প্রশ্ন-৮: যাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে অভিশাপের জন্য উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ সর্ব-হযরত 'আলী, ফাতিমা, আল-হাসান এবং আল-হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম), তাঁরা কি আল্লাহর রাসূল (দ:) ও তাঁর (ঐশী) মিশনের পক্ষের দাবিতে অংশীদার ছিলেন?

জনৈক শিয়া ভাষ্যকার নিজ তাফসীরে বলেন, দাবি এবং এর ফলশ্রুতিতে অভিশাপ দান যদি শুধুমাত্র প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে হতো, তবে একটি দল (অর্থাৎ, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবচন ব্যবহারের দ্বারা দাবি করতেন এবং অপর দলটি করতো বহুবচন ব্যবহার করে। এসব ক্ষেত্রে এমন একটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন যা একবচন এবং বহুবচন উভয়ই ব্যক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, আলোচ্য বাক্যটি এভাবে লেখা যেতে পারে: এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা বলছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। কিন্তু বাক্যটি বলে, "... মিথ্যাবাদীদের উপর (অভিশাপ)।" এটা প্রমাণ করে যে প্রকৃতপক্ষে

[৫০] অর্থাৎ "এবং নিজ গৃহে অবস্থান করো" (কুর'আন ৩৩:৩৩)

বিতর্ককারী একটি দলে মিথ্যাবাদী (বহুবচনে) ছিলো, তা হয় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষে, নতুবা খ্রিস্টানদের পক্ষে। ফলশ্রুতিতে যাঁরা অভিশাপের জন্য বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা সকলেই ওই দাবির অংশীদার হবেন - কারণ কোনো দাবিকে মিথ্যে বলে পূর্বেই ধরা নেয়া হয়।

সুতরাং এ থেকে শিয়া গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায় যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)'এর দাবি ও মিশন একই ছিলো, তাই তিনি (সা:) অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্না) আহলে বাইত ছিলেন না, তাই তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হননি।

উত্তর: নাজরানের প্রতিনিধি দলে যে সমস্ত খ্রিস্টান এসেছিলো তারা একটি দাবির একটি দল ছিলো - তাদের দাবি ছিলো 'ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) ছিলেন খোদা, খোদার পুত্র এবং তিন খোদার (মানে ত্রিত্বের) একজন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিলো না এবং তাদের নারী-পুরুষের মধ্যে এ দাবিতে কোনো পার্থক্যও ছিলো না।

অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে এই দাবি ছিল যে আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; আর মরিয়মের পুত্র ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) ছিলেন তাঁরই বান্দা ও রাসূল। এখন যদি সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাবির অংশীদার হতেন, তবে এই দাবিটি এমন কী সমস্ত মু'মিনদের দ্বারাও বহাল থাকতো; এটা তাঁদের মাত্র চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। কেননা, স্পষ্টতই সে সময়ের প্রত্যেক ঈমানদার একই দাবি করতেন। এমন কী সবচেয়ে কট্টর শিয়াবর্গও অন্তত একমত হবে যে, সর্ব-হযরত আব্বাস, সালমান ফারসী, আবু জর গিফারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখেরও দাবি একই হতো। তারা এ কথা বলতে পারবে না যে এই সাহাবী (রা.)-বৃন্দের দাবি ভিন্ন ছিলো। অতএব, এ কথা বলা যাবে না যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাঁদেরকে অভিশাপের জন্য সাথে নিয়ে এসেছিলেন

তাঁরা তাঁরই দাবির অংশীদার ছিলেন আর অন্যান্য মুসলিমবৃন্দ এই দাবি রাখেননি বিধায় তাঁদের আনা হয়নি।

তদুপরি, দাবি এবং মিশন দুটি ভিন্ন জিনিস। তাহলে কীভাবে মুবাহিলার জন্য নেয়া ব্যক্তিবৃন্দ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিশনে শরীক হন? যদি দাবি করা হয় 'আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মরিয়মের পুত্র ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁরই বান্দা ও রাসূল,' তাহলে প্রত্যেক মু'মিনের মিশনও ছিল এই একই, এবং কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

আর (৩/৬১ আয়াতোল্লিখিত) "মিথ্যাবাদীদের" শব্দটির ক্ষেত্রে আপনারা যদি বোঝাতে চেষ্টা করেন পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো এ কারণে যে তাঁরা একই দাবিকে সমর্থন করেছিলেন, তাই বহুবচন (মিথ্যাবাদীদের) ব্যবহার করা হয়েছিল, তাহলে আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না যে অন্যান্য ঈমানদারবৃন্দও এই একই দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। সুতরাং আপনাদের যুক্তি ভুল এবং অসার। আর যদি "মিথ্যাবাদীদের" বহুবচন শব্দটি থেকে আপনারা বোঝান সর্ব-হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাবিতে অংশীদার ছিলেন, তাই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছিলো, তাহলে আপনারা এমন কী এ কথাও অস্বীকার করতে পারবেন না যদি আমরা বলি "মিথ্যেবাদীদের" শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাথে সাথে সকল ঈমানদারেরও এই একই দাবি উত্থাপন করার কারণে।

উত্তর-১: আসলে "মিথ্যাবাদীদের" শব্দটি বহুবচনে উভয় পক্ষের জন্য আ'ম তথা সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিলো। কেননা "আমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে" - বাক্যটির গঠন থেকে স্পষ্ট হয় আয়াতে ব্যবহৃত প্রাথমিক শব্দগুলো হচ্ছে "আমাদের" যা বহুবচন। এই কারণেই আপনারা শেষে "মিথ্যাবাদীদের" মর্মে একটি বহুবচন শব্দ খুঁজে পান।

উত্তর-২: তদুপরি আয়াতটি বলেছে ("এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে! অতঃপর মুবাহালাহ করি। তারপর মিথ্যেবাদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত দিই")। "এসো, আমরা" নির্দেশ করে যে বিবৃতিটি উভয় পক্ষের জন্য আ'ম/সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছিলো; এবং যেহেতু খ্রিস্টানবর্গ একাধিক ছিলো, তাই একটি বহুবচন রূপ ব্যবহার করা হয়েছিলো, যা এমন কী তাদের প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। সুতরাং এটা বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছিলো। আমরা আল-কুর'আনের কিছু আয়াতে অনুরূপ উদাহরণ খুঁজে পাই যেখানে একটি পুংলিঙ্গ শব্দ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا। অর্থাৎ ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো) ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এটা এমন কী মহিলা ঈমানদারদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে; কেননা এটা আ'ম/সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সবশেষে আপনাদের নির্দোষ/মা'সূম ইমামের একটি বর্ণনাও আপনাদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায়। ইমাম জা'ফর আস-সাদিক (রহমতুল্লাহি আলাইহ) বলেছেন: "তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, '(যদি তোমরা আমার কথার সাথে একমত না হও) তাহলে আমার সাথে আন্তরিকভাবে মুবাহালা করো; অতঃপর আমি সত্যবাদী হলে তোমাদের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ করা হবে এবং যদি আমি মিথ্যেবাদী হই তবে আমার উপর অভিশাপ নাযিল হবে।' তারা বল্লো: 'আপনি ন্যায়বিচার করেছেন'।" (তাফসীরে কুম্মী)

লক্ষ্য করুন যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি আমি মিথ্যাবাদী হই" ..(নাউজুবিল্লাহ)। কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি, "যদি আমরা মিথ্যাবাদী হই।" এ থেকে প্রমাণ হয় যে এটা কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাবি ছিলো। অতএব, আপনাদের উপলব্ধি ভুল ছিলো। হয় আপনারা বলতে পারেন এটা সমস্ত ঈমানদারের সাধারণ/সার্বিক দাবি ছিলো, নতুবা এটা কেবলমাত্র নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাবি ছিলো।

উপসংহারঃ

আমরা দেখতে পেয়েছি যে মুবাহিলায় যাঁদের আনা হয়েছিলো তাঁদের বেলায় “আহলে বাইত” শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং “গোটা আহলে বাইত”-কে আনার জন্য কোনো শর্তারোপও করা হয়নি। এটা কেবল “পুত্রদের” এবং “মহিলাদের” উল্লেখ করেছে, আর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বংশধরদের নিয়ে এসেছিলেন, যাতে খ্রিস্টানদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয় যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সত্য নবী। আর সেখানে এমন শর্তও ছিলো না যে মুবাহিলার জন্য কেবল যোগ্য ব্যক্তিদেরই আনতে হবে অথবা সদস্যদের নির্দোষ হতেই হবে। “এমন কী খ্রিস্টান বিরোধীরাও এটাকে একইভাবে বুঝতে পেরেছিলো,” তবে দুর্ভাগ্যবশত খ্রিস্টানদের চেয়ে শিয়াদের কুরআন মজীদ সম্পর্কে দুর্বল উপলব্ধি রয়েছে।

এই ঘটনাটি কোনোভাবেই কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি কর্তৃক প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্না)-কে আহলে বায়ত থেকে বাদ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না। ঠিক একইভাবে কুর’আন মজীদে ‘অপবিত্রতা দূরীকরণের’ আয়াতটি দ্বারা যাঁদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর পুতঃপবিত্র স্ত্রীবৃন্দ ছিলেন - এটা অস্বীকার করার জন্যেও এ ঘটনাটিকে ব্যবহার করা যায় না। কেননা তাঁদেরকে আল-কুর’আনে ‘আহলে বাইত’ বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (৩৩/৩৩)। এ বিষয়টি আমরা আমাদের আরেকটি প্রবন্ধে প্রমাণ করেছি।[৫১]

[৫১] লিঙ্কঃ https://youpuncturedtheark.wordpress.com/2013/07/28/our-articles-proving-wives-of-prophetsaw-being-part-of-aal-and-ahlelbayt-of-prophetsaw/

সর্ব-হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর গুণ ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব

একটি অনলাইন সাইটের ভাষ্যের সারসংক্ষেপ

ভ্রান্ত শিয়াচক্র দাবি করে থাকে যে হযরত আলী মুরতজা (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) অন্যান্য সাহাবা কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বেশি অবদান রেখেছেন এবং যোদ্ধা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে, ফিক্বহী জ্ঞান ও কুর’আনের তাফসীর জ্ঞানসূত্রে তাঁর সাথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং বিশেষ করে হযরত উমর ফারূক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কোনো বিষয়ে না জানার সময়ে পরামর্শ করতেন। তাহলে তাঁদেরকে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয় কেন?

নিঃসন্দেহে মহান সাহাবী ‘আলী ইবনে আবি তালিব (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদের একজন। তিনি তাঁর সাহসিকতার জন্য ছিলেন সুপরিচিত। তিনিই প্রথম যুবক যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন; তারপর হিজরতের আগে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মক্কা ত্যাগ করেন, তখন হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন এবং নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানায় শুয়েছিলেন (এভাবে ওই মুশরিকদের বোকা বানিয়েছিলেন যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল)। হযরত সাহল ইবনে সা’দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে তাঁর (আলী কঃ-এর) ফযীলতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে তিনি (সাহল রা.) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খায়বার দিবসে বলতে শুনেছেন -

«لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر

فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء) رواه البخاري ٢٩٤٢، ومسلم ٢٤٠٦

অর্থ: "আমি পতাকাটি এমন একজনকে দেবো যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" তাঁরা উঠে দাঁড়ান, কাকে পতাকা দেয়া হবে তা দেখার উদ্দেশ্যে। তাঁদের প্রত্যেকে আশা করেছিলেন যে তাঁকেই পতাকা দেয়া হবে। অতঃপর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে বলা হয় তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন যে 'আলী (ক.)-কে তাঁর কাছে যেনো ডাকা হয়। এরপর তিনি তাঁর চোখে থুথু ছিটিয়ে দিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেনো তাঁর চোখে কোনো সমস্যাই হয়নি।[৫২]

ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর যেমন অনেক গুণ (ফযায়েল) ও উন্নত বৈশিষ্ট্য (মানাকীব) ছিল, তেমনি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এরও অনেক গুণ ও উন্নত বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফযীলতের মধ্যে তা রয়েছে যা হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন:

(خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال: يا أبا بكر، لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر) رواه البخاري ٤٦٦، ومسلم. ٢٣٨٢

[৫২] আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত, ২৯৪২; মুসলিম, ২৪০৬।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি খুতবা দেন এবং বলেন, "আল্লাহতায়ালা তাঁর একজন বান্দাকে এই দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা আছে, এই দুইয়ের মধ্যে একটি পছন্দ দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে তাই বেছে নিয়েছেন।" এতদশ্রবণে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদতে লাগলেন, এবং আমি মনে মনে বললাম, "এই বৃদ্ধের কান্নার কারণ কী হতে পারে, যদি আল্লাহতায়ালা একজন বান্দাকে এই দুনিয়া এবং তাঁর কাছে যা আছে তার মধ্যে একটিকে বাছাই করতে দেন এবং তিনিও আল্লাহর কাছে যা আছে তা বেছে নেন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই বান্দা ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আবূ বকর, কেঁদো না। সাহচর্য ও অর্থের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলো আবূ বকর।। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্যে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রহণ করতাম তবে আমি আবূ বকরকেই বেছে নিতাম। কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্বই যথেষ্ট। আবূ বকরের (ঘরের) দরজা ছাড়া মসজিদে (প্রবেশের) কোনো (ঘরের) দরজাই আর খোলা রাখবে না।"[৫৩]*

হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আরেকটি গুণ হলো এই যে, তিনি (মদীনায়) হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

[৫৩] আল-বুখারী বর্ণিত, ৪৬৬; মুসলিম, ২৩৮২।

* **বঙ্গানুবাদকের নোট:** এই দলিলে প্রমাণ হয় যে হযরতে আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রূহানী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার মর্ম একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহসা বেসাল শরীফ হতে চলেছে। অন্য কেউই এটা বুঝতে পারেননি। তিনি যে সবার চেয়ে আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগামী ছিলেন তা এই দলিলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

অর্থ: যদি তোমরা 'মাহবূব'কে সাহায্য না করো (তাতে কিছু এসে যায় না), তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে - শুধু দু'জন থেকে (একজন হলেন তিনি - অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অপরজন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন তাঁরা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন আপন সঙ্গীকে ফরমাচ্ছিলেন, 'দুঃখিত হয়ো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁকে এমন এক (ফেরেশতাদের) সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা দেখো নি এবং তিনি কাফিরদের কথা নিচে নিক্ষেপ করেছেন; আল্লাহর কথাই সর্বোপরি; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৫৪]

আর হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে যাতুস্ সালাসিলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি বর্ণনা করেন:

(فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا) رواه البخاري ٣٦٦٢، ومسلم ٢٣٨٤

অতঃপর আমি তাঁর (দ.) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষদের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি উত্তরে বললেন, "আয়েশা।" আমি প্রশ্ন করলাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি জবাবে বললেন, "তার বাবা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি উত্তরে বললেন, "তারপর 'উমর ইবনুল খাত্তাব' এবং তিনি আরো কয়েকজন পুরুষের কথা উল্লেখ করলেন।[৫৫]

হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আরেকটি গুণ হলো, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর যাহেরী/প্রকাশ্য হায়াতে

[৫৪] সূরা তওবাহ, ৯/৪০; নূরুল ইরফান।

[৫৫] আল-বুখারী বর্ণিত, ৩৬৬২; মুসলিম, ২৩৮৪।

জিন্দেগীর শেষভাগে তাঁকে তাঁর (দ.) পরিবর্তে নামাযের ইমামতি করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর শেষ অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তিনি সেসব ব্যক্তিকে তিরস্কার করেছিলেন যারা এতে আপত্তি জানিয়েছিল; প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مروا أبا بكر فليصل بالناس. رواه البخاري ٦٨٣، ومسلم ٤١٨

"আবূ বকরকে বলো সে যেনো মানুষদের নামাযের ইমামতি করে।"[৫৬]

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী পাক (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব-হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সাথে উহুদের পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং তাঁদের পায়ের নিচে তা কাঁপতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري ٣٦٧٥، وغير ذلك.

"হে উহুদ, দৃঢ় হও, কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।"[৫৭]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারেও তাঁর অনেক গুণ ও উন্নত বৈশিষ্ট্য ছিল যা বহু বর্ণনায় প্রমাণিত। যেমন - হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين) رواه البخاري ٢٣، ومسلم ٢٣٩٠

[৫৬] আল-বুখারী বর্ণিত, ৬৮৩; মুসলিম ৪১৮।

[৫৭] আল-বুখারী বর্ণিত, ৩৬৭৫; এবং অন্যান্যরাও।

"আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম মানুষদেরকে আমার সামনে প্রদর্শন করানো হচ্ছে এবং তারা কামিস্/জামা পরা অবস্থায় ছিল। কিছু জামা বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে, আবার কিছু তার চেয়েও খাটো। 'উমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার সামনে দেখানো হয়েছিল এবং সে একটি জামা পরেছিল যা মাটিতে টানতে হচ্ছিল।" সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি এর ব্যাখ্যা কীভাবে করেন? তিনি উত্তরে বলেন, "ধর্মপরায়ণতা/ধার্মিকতা।"[৫৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

(بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم) رواه البخاري ٨٢، ومسلم ٢٣٩١

"আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, তখন আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো এবং আমি তা পান করলাম যতোক্ষণ না আমি দেখতে পেলাম যে আমার নখ থেকে ভেজা বেরিয়ে আসছে। অতঃপর বাকিটুকু উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিয়ে দিলাম।" সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি এর ব্যাখ্যা কীভাবে করেন? তিনি উত্তরে বললেন, "(এটা দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয়) জ্ঞান।"[৫৯]

আর মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

(قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم). رواه مسلم ٢٣٩٨

[৫৮] আল-বুখারী বর্ণিত, ২৩; মুসলিম, ২৩৯০।
[৫৯] আল-বুখারী বর্ণিত, ৮২; মুসলিম, ২৩৯১।

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে মুহাদ্দাসূন (ঐশী প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিবর্গ) ছিল; এবং আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তাহলে উমর ইবনুল খাত্তাব তাদের একজন।[৬০]

এছাড়াও অন্যান্য প্রমাণ রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-বৃন্দের ফযীলতকে নির্দেশ করে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা এমন একটি বিষয় যা অর্থবহ এবং শরী'আতে প্রমাণিত। এটা মনের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়, বরং এর ফায়সালা শরী'আতের প্রতি আরোপ করা উচিত, ঠিক যেমনটি আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থ: এবং আপনার রব/প্রভু সৃষ্টি করেন যা চান এবং পছন্দ করেন। তাদের কোনো ক্ষমতা নেই (কোনো বিষয়েই)। পবিত্রতা আল্লাহরই এবং তিনি তাদের শির্ক থেকে বহু ঊর্ধ্বে।[৬১]

তাই আমাদের উচিৎ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-বৃন্দের মর্যাদা জানার জন্য শরয়ী দলীলের শরণাপন্ন হওয়া। হযরত ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهمî رواه البخاري ٣٦٥٥، وفي رواية قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم البخاري ٣٦٩٧

"আমরা মানুষদের মধ্যে তুলনা করতাম যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে কে উত্তম ছিলেন। আমরা হযরত আবূ বকর

[৬০] মুসলিম, ২৩৯৮।
[৬১] সূরাহ কাসাস, ২৮/৬৮; নূরুল ইরফান।

(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে সর্বোত্তম, তারপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতাম"।[৬২] অন্য একটি বর্ণনায় তিনি আরো বলেন: "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় আমরা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমকক্ষ কাউকে মনে করতাম না। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবা (রা.)-দের মধ্যকার ফযীলতের তুলনা ছেড়ে দেই (এবং তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনি)।"[৬৩]

এটা সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাক্ষ্য, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত এ মর্মে যে, সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হতে প্রথমতঃ হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু , তারপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এবার আসুন হযরত 'আলী ইবনে আবি তালিব (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর দিকে ফিরে তাকাই এবং তিনি কী বলেছেন তা দেখি। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (যিনি ছিলেন আলী ইবনু আবি তালিবের পুত্র) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

(قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين). رواه البخاري ٣٦٧١

"আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন, 'আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারপর কে?' তিনি জবাবে বললেন, 'তারপর 'উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।' আমি ভয়

৬২ আল-বুখারী, ৩৬৫৫।
৬৩ আল-বুখারী, ৩৬৯৭।

পেয়েছিলাম যে তিনি 'উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আপনি কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন মাত্র'।[৬৪]

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেছেন:

(لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري)

"আমার কাছে এমন কাউকে যদি আনা হয়, যে আমাকে সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে, তবে আমি তাকে অপবাদের দায়ে প্রহারের শাস্তি (হাদ্দ) দেবো।"

ইবনে তাইমিয়া বলেন: বর্ণিত হয়েছে যে তিনি কুফার মিম্বরে খুতবা দিতেন এবং বলতেন যে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। এটা তাঁর কাছ থেকে আশিটিরও বেশি ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলো আল-বুখারী এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তাই পূর্ববর্তী শিয়াবর্গ সবাই একমত পোষণ করতেন যে সর্ব-হযরত আবূ বকর এবং উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ঠিক যেমনটি একাধিক শিয়া আলেম কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৫]

وعن أبي جحيفة: أن عليا رضي الله عنه صعد المنبر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر رضي الله عنه، وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحبî رواه الإمام أحمد في مسنده٨٣٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي

আবূ জুহাইফাহ থেকে বর্ণিত যে, ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন, আর

৬৪ আল-বুখারী, ৩৬৭১।
৬৫ মানহাজ আস্ সুন্নাহ, ১/৩০৮।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন; অতঃপর তিনি বলেন: "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর এই উম্মতের মাঝে উত্তম হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); দ্বিতীয় উত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত 'উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং তারপর আল্লাহ যাঁর মঙ্গল চান তিনিই উত্তম।[৬৬]

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হাদীসগুলো এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-বৃন্দের এতদসংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সবই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং তারপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহ তায়ালা সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সর্বদা হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের কোনো জ্ঞান ছিল না মর্মে এমন ধারণার বিষয়ে বলবো, এটা কোনো আসার তথা সাহাবী (রা.)-বৃন্দের বাণী বা বক্তব্যে প্রমাণিত নয়। বরং এটা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতায় পীড়িত ছিলেন তখন এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেনো হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মানুষদের নামাযের ইমামতি করেন। নামাযের হুকুম সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দায়িত্ব অর্পণ করতেন না। আর এটা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হজ্জের ইমামতি করার জন্যেও নিযুক্ত করেছিলেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ব্যক্তিকে এ ধরনের পদে নিযুক্ত করতেন না, যদি না তিনি সাহাবা (রা.)-বৃন্দের মাঝে (হজ্জ) সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী

[৬৬] ইমাম আহমাদ হাম্বল (রহ.) কৃত মুসনাদ, ৮৩৯; শায়খ শুয়াইব আল-আরনাউত (রহ.) বলেছেন, এর সনদ কাওয়ী/শক্তিশালী।

হতেন। প্রকৃতপক্ষে এও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে কয়েকটি বিষয়ে কিছু হাদীস শিখেছিলেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসমা বিনতে আল-হাকাম আল-ফাযারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

(سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية۔ ((وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ)) إلى آخر الآية). رواه الترمذي ٤٠٦

আমি হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে বলতে শুনেছি: 'আমি এমন একজন ব্যক্তি ছিলাম যে, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একটি হাদীছ শুনতাম, তবে এর দ্বারা আল্লাহ আমাকে যতোটা উপকার করতে চেয়েছিলেন ততোটা আমাকে উপকৃত করেছেন। যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি আমার কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করতেন, তাহলে আমি তাঁকে সেটার সত্যতার ব্যাপারে কসম করতে বলতাম; যদি তিনি শপথ করতেন তাহলেই আমি তাঁকে বিশ্বাস করতাম।' হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) আমাকে (মানে হযরত আসমা বিনতে ফাযারী-কে) বলেন: 'হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সত্য বলেছেন এ মর্মে যে, "আমি (হযরত আবূ বকর) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'এমন কোনো লোক নেই, যে পাপ করে আর তারপর (রাতে) উঠে নিজেকে পবিত্র করে এবং (নামাযে) প্রার্থনা

করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নিম্নের) এই আয়াতটি পাঠ করেন - এবং ওই সব লোক, যখন তারা কোনো অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলম করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৩৫; নূরুল ইরফান)।"[৬৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ وروى الترمذي (٣٦٨٢)

অর্থ: ইমাম আৎ তিরমিযী (৩৬৮২) হযরত ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ উমরের জিহ্বায় এবং তাঁর অন্তরে সত্য স্থাপন করেছেন।"[৬৮]

মোদ্দা কথা হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস, যার ওপর তাঁরা (সুন্নী আলেম-উলামা) সর্বসম্মতিক্রমে একমত, তা হলো নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), তারপর হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহতায়ালা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইবনে তাইমিয়া বলেন:

لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين: إن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر بل ولا من أبي بكر وحده، ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم، بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي، منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني

৬৭ আত-তিরমিযী, ৪০৬; এর মান - হাসান।

৬৮ হাদীসের মান - সহীহ।

المروذي، أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي ذكر في كتابه: تقويم الأدلة على الإمام إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي، وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك، وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ولما هاجرا جميعا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه: يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه السلام على سائر أصحابه، مثل قصة مشاورته في أسرى بدر، فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر، وكذلك غير ذلك،، وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فقال: (إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا)، وقد ثبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي، وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مجموع الفتاوى ٣٩٨/٤

অর্থ: "সম্মানিত মুসলিম উলামা/পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই বলেননি যে, হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন বা ইসলাম সম্পর্কে বেশি বুঝতেন; এমনকি হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর একার

চেয়েও বেশি বুঝতেন। যারা দাবি করে যে এই ভ্রান্ত ধারণার ওপর (উলামাবৃন্দের) ঐকমত্য আছে তারাই সবচেয়ে অজ্ঞ এবং সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। বরং একাধিক আলেম বলেছেন যে পণ্ডিতদের ঐকমত্য রয়েছে এ মর্মে যে হযরত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন; যেমন - ইমাম মনসূর ইবনে আবদুল জাব্বার আল-সাম'আনী আল-মারওয়াযী (রহ.) যিনি ইমাম আশ-শাফাঈ (রহ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সুন্নী আলেম ছিলেন, তিনি তাঁর 'তাকৃউয়ীমুল-আদিল্লাহ 'আলাল-ইমাম' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সুন্নী পণ্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল এ মর্মে যে হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। আমি বিখ্যাত ইমামদের মধ্যে এমন কাউকে চিনি না যিনি এই বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এর অন্যথা কেমন করে হতে পারে যখন হযরত আবূ বকর আস্ সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শরঈ হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন, ফায়সালা দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে খুতবা দিতেন, যেমনটি তিনি করতেন যখনই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বের হতেন এবং যখন তাঁরা একসাথে হিজরত করেছিলেন এবং এর পাশাপাশি হুনাইনের যুদ্ধের দিনে এবং অন্যান্য উপলক্ষে; যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নীরব থাকতেন এবং এ সব অনুমোদন করতেন। হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো অন্য কেউই এই ধরনের মর্যাদা লাভ করেননি। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর সাহাবা (রা.)-দের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন, তখন তিনি প্রথমে সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে পরামর্শ করতেন, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে তাঁর বাকি সাহাবা (রা.)-দের সামনে তাঁরাই প্রথমে ইসলামী বিষয়াদি সম্পর্কে কথা বলতেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদর জ্বিহাদের বন্দীদের সম্পর্কে সাহাবা (রা.)-বৃন্দের সাথে পরামর্শ করেছিলেন, তখন প্রথম যাঁরা এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন তাঁরা হলেন সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহুমা), এবং এটা অন্যান্য উপলক্ষেও ঘটেছে। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবা (রা.)-বৃন্দ তাঁর সাথে সফরে ছিলেন এবং তিনি বলেন: 'লোকেরা যদি আবূ বকর ও উমরের আনুগত্য করে তবে তারা সৎপথে পরিচালিত হবে।' আর হযরত ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতেন এবং (তাতে সমর্থনসূচক) কিছু না পেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের দিকে তাকাতেন; এরপরও যদি তিনি (তাতে) কিছু না পেতেন তবে তিনি সর্ব-হযরত আবূ বকর এবং উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ফতোয়াগুলি থেকে ফায়সালা নিতেন; এরপরও যদি তিনি (তাতে) কিছু না পেতেন তবে তিনি সর্ব-হযরত উসমান এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ফতোয়াগুলি থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন - আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন হাবর আল-উম্মাহ (উম্মাহর পণ্ডিত) এবং তিনি তাঁর সময়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী আলেম; আর তিনি সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে পরামর্শ করতেন এবং সাহাবা (রা.)-দের মধ্যে অন্য কারো কথার উপর তাঁদের পরামর্শকেই অগ্রাধিকার দিতেন। অধিকন্তু এটা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, তাকে ইসলামী দ্বীন বোঝার এবং (কুরআনের) সঠিক তাফসীর/ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন।"[৬৯]

আরো দেখুন -

(ক) আল-ফাসল ফীল-মিলাল ওয়ান্ নিহাল, ৪/২১২;
(খ) বাল্ দ্বলালাহ, ২৫২ পৃষ্ঠা;
(গ) আশ্ শী'আতুল ইমা'মিয়্যাতুন্ ইসনা আশারিয়্যাহ।*

---

[৬৯] মজমূআ আল-ফাতাওয়া, ৪/৩৯৮।

* **বঙ্গানুবাদের নোটঃ** ইবনে তাইমিয়ার কিছু ফতোয়া গোমরাহী। তবে এখানে তিনি আহলে সুন্নাতের ইমামদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে সঠিক ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর গোমরাহী সম্পর্কে জানতে আল্লামা হুসাইন হিলমী তুর্কি (রহ.)-এর প্রণীত ও আমার অনূদিত 'নব্য ফিতনা সালাফিয়া' শীর্ষক পুস্তিকাটি দেখুন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে ভালোবাসা ঈমানদারী

সুন্নী আলেম-উলামা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলে থাকেন, "আহলে বাইত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ভালোবাসা ও সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে সম্মান করা ঈমানদারী।" কিন্তু আমি বলি, উভয়কে ভালোবাসাই ঈমানদারী। কেননা, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন-

اللّٰهُ اللّٰهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّٰهَ وَمَنْ آذَى اللّٰهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

অর্থাৎ, "আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আমার (বেসাল শরীফের) পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র হিসেবে গ্রহণ কোরো না। অতঃপর যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমার মুহাব্বাতেই তাদেরকে মুহাব্বাত করলো। পক্ষান্তরে যে লোক তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা রাখে, সে আমার প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা রাখলো। আর যে লোক তাদেরকে দুঃখ বা কষ্ট দিলো, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে লোক আমাকে কষ্ট দিলো সে আল্লাহতায়ালাকেই কষ্ট দিলো। অতএব যে লোক আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে অতি সত্বর পাকড়াও করবেন"।[৭০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত হাদীস শরীফে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ভালোবাসা তাঁরই প্রতি ভালোবাসার নামান্তর। তাঁকে ভালোবাসা কি ঈমান নয়? অতএব, তাঁর সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দকে ভালোবাসাও

[৭০] ১। তিরমিযী: আস্ সুনান, বাবু ফী মান সাব্বা আসহাবিন নবী, ১২:৩৬২, হাদীস নং ৩৭৯৭;
২। তাবরিযী: মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবিল কুরাইশ...পৃষ্ঠা ৩০৯, হাদীস নং ৬০০৫;
৩। আহমদ ইবনে হাম্বল: আল-মুসনাদ, বাবু হাদীসি আবদিল্লাহ ইবনে মাগফল, ৩৪:১৫৮, হাদীস নং ১৬২০১।

ঈমানের দাবি বলে তিনি স্বয়ং শর্ত জুড়ে দিয়েছেন! আমরা পরবর্তী মুসলমান প্রজন্ম তাঁর এ নির্দেশ মানতে বাধ্য! এর ব্যতিক্রম প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর দরবারে গৃহীত হবে না।

সম্মান প্রদর্শনসম্পর্কিত হাদীস

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا مَنْ سَرَّهُ بُحْبُوحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سيئته فَهُوَ مُؤْمن».

صحيح ، رواه [النسائى فى الكبرى (٥/٣٨٧ ـ ٣٨٨ ح ٩٢٢٢ ـ ٩٢٢٤) و عبد بن حميد (٢٣) وله طريق آخر عند الحميدى (٣٢) و الترمذى (٢١٦٥ وقال : حسن صحيح غريب)] ـ (صَحِيح)

অর্থ: হযরত 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমার সাহাবীদেরকে সম্মান করো। কেননা তারা তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর তৎপরবর্তী মানুষদেরকে (তাবেঈন), অতঃপর তৎপরবর্তী মানুষদেরকে (তাবে' তাবেঈন), এরপর প্রকাশ্যে মিথ্যা চলতে থাকবে। এমন কী কোনো লোক কসম করবে, অথচ তার কাছ থেকে কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দেবে, অথচ তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেনো জামা'আতকে ধরে রাখে (অর্থাৎ সাহাবী, তাবিঈ, তাবি তাবিঈন ও সালাফে সালিহীনবৃন্দের অনুসরণ করে চলে)। কেননা শয়তান একাকী লোকের সাথে থাকে। আর সে দু জনের জামা'আত হতে বেশি দূরে থাকে। তোমাদের কেউ যেনো কোনো বেগানা (পর) নারীর সাথে নির্জনে

অবস্থান না করে। কেননা শয়তান তৃতীয় লোক হিসেবে তাদের সাথে উপস্থিত থাকে। আর যার ভালো কাজে মনের মধ্যে আনন্দ জাগে এবং বদকাজ তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে, সে-ই প্রকৃত ঈমানদার।[৭১]

এ হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে আমাদের, মানে উম্মতের, মাঝে 'সর্বোত্তম' (خِيَارُكُمْ) মানুষ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাঁদের মর্যাদা, বিশেষ করে শীর্ষস্থানীয় সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-মণ্ডলীর মর্যাদা স্পষ্ট বোঝা যায়। কেউ অন্য কারোর সাথে তাঁদের তুলনা দিয়ে তাঁদেরকে খাটো করতে চাইলে সে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা/বাণী বিকৃত করে অমান্য করার পাঁয়তারা করছে বলেই বিবেচিত হবে। শিয়াদের আশুরার মজলিশে এ ধরনের অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সুন্নীদের আশুরার মাহফিলে এ ধরনের বক্তব্য দান হতে সবার সতর্ক থাকা উচিত। বস্তুতঃ আকীদা-বিশ্বাসগত বিষয়ে কোনো রকম ছাড় নেই!

---

[৭১] সহীহ: আস সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী, ৯২২২; মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার, ৫২; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, ২০৭১০; মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ, ২৩; মুসনাদুশ শাফি'ঈ, ১২০৭; মুসনাদুল হুমায়দী, ৩২; শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী, ১৫০৬; আল মু'জামুল আওসাত্ব, ২৯২৯; আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বাবারানী, ২৪৫।

ইমামে আলী (ক.) ও তাঁর পরিবারের দৃষ্টিতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) ও তাঁর দল

মূল: মওলানা নাফেঈ

[বর্তমানে একটি বিতর্ক চলছে এ মর্মে যে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) 'বাগী' ছিলেন কি-না। অনেকে এতদসংক্রান্ত অনেক দলিল পেশ করেছেন, তবে একটি গোছালো গবেষণামূলক লেখার অভাব আমি অনুভব করেছি দীর্ঘদিন ধরে। মওলানা নাফেঈ সাহেবের রচিত একটি বইয়ের কিয়দংশে এর জবাব মিলেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় এই জরুরি অংশটুকু অনুবাদে প্রবৃত্ত হলাম। - সংকলক]

ইমামে আলী (ক.) ও তাঁর পরিবারের দৃষ্টিতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) ও তাঁর দল

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিতনার সময় মন্দ ও দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রের কারণে ইসলামের রাজধানী মদীনা মোনাওয়োরা আক্রমণ করা হয়েছিল এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান যিন্নুরাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর মুসলমানবৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একই সময়ে ওই অশুভ শক্তি বিভক্ত হয়ে সৃষ্ট মতানৈক্যে ইন্ধন দেয়ার জন্য উভয় দলের সাথে মিশে যায়। তারা মুসলমানদের একে অপরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছড়ায়। তারা বিতর্কিত বিষয়গুলিতে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ছড়িয়েছিল এবং বিষয়টিতে মারাত্মক তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত জামাল এবং সিফফীনের মতো যুদ্ধ এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটায়।

এখানে এই ঘটনাগুলির কারণ এবং কারণগুলির তালিকা করা এবং যুদ্ধের বিবরণ ও সেগুলোর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এই সকল মহান ব্যক্তিত্ব তাঁদের মধ্যে যে গুরুতর বিরোধের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের সম্পর্কে কী মতামত

পোষণ করেছেন তা নিরূপণ করা। তাঁরা একে অপরের জন্য কোন্ (শরঈ) বিধান প্রয়োগ করেছিলেন? তাঁরা একে অপরকে কীভাবে দেখেছিলেন? তাঁদের অন্তর কি একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতায় পূর্ণ ছিল? তাঁরা কি একে অপরকে চিরশত্রু হিসেবে দেখেছিলেন? সেসব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কিছু লোক সাইয়্যিদুনা মু'য়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য এবং কটূক্তি করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁকে অবিশ্বাসী, মুনাফিক এবং সীমালঙ্ঘনকারী বলে অভিযুক্ত করছে এবং তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও মন্দ প্রচার করাকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করছে।

অথচ এ সকল ব্যক্তিত্ব যাঁদের মধ্যে অস্থায়ী বিরোধ বিদ্যমান ছিল, তাঁরা বিরোধ বন্ধ করে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন এবং ওই ঐক্যের বছরের পরে সমস্ত মতপার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়।[৭২]

উপরের শিরোনামটি ব্যাখ্যা করার জন্য এই পর্যায়ে কিছু দিক নিয়ে আলোকপাত করা হবে, যা সাইয়্যিদুনা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা পোষণকৃত সাইয়্যিদুনা মু'য়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) ও তাঁর পক্ষসম্পর্কিত মতামতকে স্পষ্ট করবে। এই লক্ষ্যে সাইয়্যিদুনা আলী

[৭২] নোট: ৪০ হিজরীতে সাইয়্যিদুনা 'আলী আল-মুরতাদা (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এবং সাইয়্যিদুনা আমীর মু'য়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি সমঝোতা করেছিলেন। আলেম-উলামা সমাজের সন্তুষ্টির জন্য এখানে একটি ছোট উদ্ধৃতি পেশ করা হলো -

و في هذه السنة (سنة ٥٤٠) جرت بين علي و معاوية المهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على وضع الحرب بينهما و أن يكون ملك العراق لعلي و لمعاوية الشام و لا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة و لا غزوة ,, و أمسك كل واحد منهما عن قتال الآخر و بعث الجيوش إلى بلاده و استقر الأمر على ذلك.

এই বছর (৪০ হিজরী) অনেক চিঠিপত্রের পর আলী ও মু'য়াবিয়ার মধ্যে এমন একটি চুক্তি হয়েছিল, যার উল্লেখ এক দীর্ঘ বিষয় হবে, তা এ মর্মে হয়েছিল যে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা হবে এবং ইরাক দেশটি হবে আলী (ক.) ও শাম অঞ্চলটি মু'য়াবিয়া (রা.)-এর জন্য। তদুপরি, উভয়ের কেউই অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না, সামরিক অভিযান পরিচালনা করবেন না, আক্রমণও করবেন না, যুদ্ধও করবেন না। তাঁরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ছিলেন। প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিতে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন এবং সিদ্ধান্তটি সমর্থন দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়। (তারীখ-এ-তাবারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৮১, ৪০ হিজরী সাল; আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২২, ইবনে জারীর তাবারীর সূত্র উল্লেখসহ, ৪০ হিজরী)।

আল-মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পরিবারের বক্তব্য ও এতদসংক্রান্ত ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হবে। এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর সমর্থকবৃন্দ সকলেই ঈমানদার ছিলেন এবং তাঁদের মুর্দাদের গোসল করানো হয়েছিল, কাফন দেয়া হয়েছিল, দাফন করা হয়েছিল এবং জানাযা হয়েছিল।

عن سعد بن إبراهيم قال خرج علي بن أبي طالب ذات يوم ومعه عدي بن حاتم الطائي فإذا رجل من طيء قتيل قد قتله أصحاب علي فقال عدي يا ويح هذا كان أمس مسلما و اليوم كافرا فقال علي مهلا كان أمس مؤمنا وهو اليوم مؤمن.

সা'আদ ইবনু ইবরাহীম বর্ণনা করেন:

ইমামে আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) একদিন আদী ইবনে হাতেম আত-তাঈ-কে সাথে নিয়ে বের হন। তাঁরা তাঈ অঞ্চলের একজন (যুদ্ধে) নিহত ব্যক্তিকে দেখতে পান যাঁকে ইমামে আলী (ক.)-এর সমর্থকবৃন্দ হত্যা করেছিলেন। আদী মন্তব্য করেন, "কতো দুর্ভাগ্যজনক! সে গতকালও মুসলমান ছিল এবং আজ সে কাফের।"

আলী (ক.) পাল্টা জবাব দেন, "অপেক্ষা করো (এতো তাড়াতাড়ি রায় দেবে না)! গতকালও সে মু'মিন ছিল এবং আজও সে একজন মুমিন" (অর্থাৎ, আমাদের বিরোধিতা করার কারণে সে তার ঈমান হারায়নি; বরং সে এখনও ঈমানদার)।[৭৩]

محمد بن راشد عن مكحول أن أصحاب علي سألوه عن من قتلوا من أصحاب معاوية قال هم المؤمنون و في رواية عن من قتل بصفين ما هم قال هم المؤمنون

[৭৩] তারীখু ইবনু আসাকির কামিল, ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা, দামেশক সংস্করণ; তালখীস ইবনু আসাকির, কৃত: ইবনু বাদরান আবদুল কাদির ইবনু আহমদ, যিনি ইবনু বাদরান আল-দামিশকী নামে সমধিক পরিচিত; ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা; সিফফীন যুদ্ধে নিহত শামদেশীয় যোদ্ধাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ বর্ণনাসমূহের অধ্যায়।

অর্থ: মুহাম্মাদ ইবনে রাশিদ বর্ণনা করেছেন মাকহূল হতে, যিনি বর্ণনা করেন:

ইমামে আলী (ক.)-এর সমর্থকবৃন্দ তাঁকে আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষের সেসব মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যাঁরা নিহত হয়েছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন, তাঁরা মু'মিন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে: তাঁরা তাঁকে (ক.) সিফফীনে নিহতদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা কী (বিবেচিত হবেন)? তিনি উত্তর দেন, "তাঁরা মু'মিন।"[৭৪]

قال عقبة بن علقمة اليشكري شهدت مع علي يوم صفين فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه.

অর্থ: উকবা ইবনে আলকামাহ আল-ইয়াশকুরী বর্ণনা করেছেন:

আমি সিফফীনের যুদ্ধের দিনে ইমামে আলী (ক.)-এর পাশে উপস্থিত ছিলাম। আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সমর্থকদের ১৫ জন বন্দীকে তাঁর (ক.) কাছে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যিনিই ইন্তেকাল করতেন, ইমামে আলী (ক.) তাঁকে গোসল দিতেন, কাফন পরাতেন এবং তাঁর জানাযার নামাজ পড়াতেন।[৭৫]

সাইয়্যিদুনা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর ঘোষণাগুলি একদম স্পষ্ট করে দেয় যে, যাঁরা সাইয়্যিদুনা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তা যে কারণেই হোক না কেন, তাঁরা সবাই মুমিন। তাঁদের গোসল, কাফন, দাফন এবং সালাত আল-জানাযা সবই সঠিক ছিল এবং সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা সম্পন্ন করেছিলেন। অতএব, তাঁদেরকে মু'মিন না বলা সায়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি অবাধ্যতা এবং তাঁরই পথ ও মতের বিরোধিতা।

[৭৪] তারীখু ইবনু আসাকির কামিল, ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা, দামেশক সংস্করণ; তালখীস ইবনু আসাকির, ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত একই অধ্যায়, প্রথম সংস্করণ; মিনহাজুস্ সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা; আল-মুনতাকা, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, মিসরীয় সংস্করণ।

[৭৫] তালখীস ইবনু আসাকির, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ, সিফফীন যুদ্ধে নিহত শামদেশীয় যোদ্ধাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ বর্ণনাসমূহের অধ্যায়।

ইমামে আলী (ক.)-এর ঘোষণার আলোকে সিফফীনের শহীদদের (শরঈ) হুকুম: তাঁরা সকলেই জান্নাতবাসী

সাইয়্যিদুনা 'আলী এবং সাইয়্যিদুনা মু'য়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ ৩৭ হিজরী সালের সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে ষড়যন্ত্রকারীচক্র তাদের (বিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টির) চক্রান্তে সফল হয়েছিল।

এই দু জন আলোকিত ব্যক্তিত্ব তাঁদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে শরঈ সীমা লঙ্ঘন করেননি। উদারহরণস্বরূপ, তাঁরা কখনোই সেসব মানুষকে হত্যা করতে চাননি যাঁরা যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়েছিলেন; তাঁরা বন্দীদের হত্যা করেননি; তাঁরা কোনো নারীর হিজাব অপসারণ করেননি: তাঁরা কোনো ব্যক্তির সম্পদ লুট করেননি; তাঁরা সেসব মানুষের সাথে শান্তি স্থাপন করেছেন, যাঁরা নিজেদের অস্ত্র সংবরণ করেছিলেন; তাঁরা নিহতদের থেকে অস্ত্র ও কাপড় অপসারণ করেননি; তাঁরা কোনো মুসলিম নর-নারীকে দাসত্ব বরণে বাধ্য করেননি; তাঁরা একে অপরের সম্পদকে লুণ্ঠনযোগ্য বলে মনে করেননি ইত্যাদি।

এসব শরঈ হুকুমের নিম্নবর্ণিত রেফারেন্সগুলো অধ্যয়ন করুন:

(ক) মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বাহ, ৪র্থ খণ্ড, ১০১৮ পৃষ্ঠা, জঙ্গে জামাল অধ্যায়, (ক্বিলমী) পীর ঝাণ্ডা সিন্ধ;

(খ) ফাতহুল কাদির শরহিল হিদায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, বাগী/বিদ্রোহী সংক্রান্ত অধ্যায়, মিসরীয় সংস্করণ;

(গ) নাসবুর্ররায়্যাহ, ৩য় খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা, বাগী অধ্যায়;

(ঘ) আল-আখবারুৎ তিওয়াল, ১৫১ পৃষ্ঠা, জামালের ঘটনা, মিসরীয় সংস্করণ।

এর থেকে আমরা এই সংঘর্ষের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারি।

এখন আসুন, নিহতদের চূড়ান্ত পরিণতির ব্যাপারে সাইয়্যিদুনা আলী আল-মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে রায় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক:

سئل علي عن قتال يوم الصفين فقال قتلانا وقتلاهم في الجنة و سيصير الأمر إلي و إلى معاوية.

অর্থ: ইমামে 'আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে সিফফীন দিবসের হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমাদের নিহত ও তাঁদের নিহতরা জান্নাতে থাকবেন। বিষয়টি আমার এবং মু'য়াবিয়ার কাছে ফিরে আসবে।"[৭৬]

ইমামে আলী (ক.)-এর ঘোষণার আলোকে জামাল ও সিফফীনের অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা

এই শিরোনামের অধীনে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, সাইয়্যিদুনা আলী আল-মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন (যেমন যাঁরা জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন), তাঁদের ব্যাপারে তিনি (ক.) কী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের প্রতি কেমন সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন? সায়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী থেকেই তা শুনুন:

سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل والصفين أمشركون هم قال لا من الشرك فروا فقيل أمنافقون قال لا لأن المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قيل له فما حالهم قال إخواننا بغوا علينا.

অর্থ: ইমামে আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এবং তিনি জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী

[৭৬] মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ, ৪র্থ খণ্ড, সিফফীন যুদ্ধের বর্ণনা অধ্যায়, (ক্বিলমী) পীর ঝাণ্ডা সিন্ধ; মজমাউয্ যওয়াঈদ, ৯ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, তবরানীর রেফারেন্স-সহ, মু'য়াবিয়াহ ইবনে আবী সুফিয়ান সম্পর্কিত বর্ণনার অধ্যায়; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, সিফফীনের ঘটনা, প্রথম সংস্করণ; সিয়্যারু আলামিন্ নুবালা, ৩য় খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, আমীরে মু'য়াবিয়া (রহ.)-এর জীবনী।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ছিলেন উদাহরণস্বরূপ: "তাঁরা কি মুশরিকীন/শরীককারী?" তিনি উত্তর দেন, "না, তাঁরা শির্ক থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।" তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "তাহলে কি তাঁরা মোনাফিকীন/মোনাফেক?" তিনি উত্তর দেন, "না, কেননা মোনাফিকীন আল্লাহকে মনে রাখে না সামান্যটুকু ছাড়া।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তাহলে তাঁদের অবস্থা কী?" তিনি বলেন, "তাঁরা আমাদেরই ভাই যাঁরা আমাদের বিরোধিতা করেছেন।"

জরুরি নোট: আলেম-উলামার অবগতির জন্য জ্ঞাতব্য যে, সাইয়্যিদুনা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই বক্তব্যটি অসংখ্য আলেম তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে দলিলস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। সংক্ষিপ্ততার কথা মাথায় রেখে বলবো, তাফসীরের বইপত্রে সূরা আল-হুজুরাতের ব্যাখ্যায়, হাদীস সংকলনে জামাল ও সিফফীন সম্পর্কে এ কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে; এটা আরো উদ্ধৃত হয়েছে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ফুকাহাবৃন্দের আলোচনায় এবং ইতিহাসের বইপত্রেও এতদসংক্রান্ত আলোচনায়। প্রবীণ শিয়া আলেমবর্গ ইমাম জা'ফর আস্ সাদিক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) থেকে আপন আপন ইসনাদের মাধ্যমে এটা বর্ণনা করেছেন। যথা -

جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق و لكن يقول هم إخواننا بغوا علينا.

অর্থ: জা'ফর তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে ইমামে 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এমন কাউকে শিরক বা মোনাফেকীর জন্যে দায়ী করতেন না, যিনি তাঁর (ক.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বরং তিনি পরামর্শ দিতেন, "তাঁরা আমাদের ভাই যাঁরা আমাদের বিরোধিতা করেছিলেন।"[৭৭]

[৭৭] আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর আল-হিমইয়ারী আশ্ শিঈ বর্ণনা করেছেন তৃতীয় প্রজন্মের উলামাদের থেকে: কুর্ব আল-ইসনাদ, ৪৫ পৃষ্ঠা, পুরোনো সংস্করণ, ইরান।

ইমামে আলী (ক.)-এর ভাষ্যে বাগী শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যাকরণ

এই দৃষ্টিভঙ্গি যা সাইয়্যেদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জামাল ও সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন যে "তাঁরা আমাদের ভাই যাঁরা আমাদের বিরোধিতা করেছেন," এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে লোকেরা অনেক কথা বলেছে। তবে সাইয়্যিদুনা 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অন্যান্য বক্তব্য থেকে যদি এর ব্যাখ্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়, তাহলে তা উপযুক্ত হবে এবং তখন দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন হবে না। জামাল ও সিফফীন উপলক্ষে সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কিছু সমর্থক চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতাকারীদেরকে তাঁরা কাফের বলে আখ্যা দিতে থাকেন। এ কথা শুনে সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি পরিষ্কার করেন।

ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) নিজ ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনাটি নিম্নোক্ত শব্দচয়নে লিপিবদ্ধ করেছেন:

أبو زرعة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سمع علي يوم الجمل أو صفين رجلا يغلو في القول يقول الكفر قال لا تقولوا فإنهم زعموا أنا بغينا عليهم و زعمنا أنهم بغوا علينا.

অর্থ: আবূ যুর'আহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, যিনি বলেন:

হযরত 'আলী (ক.) জামাল বা সিফফীন যুদ্ধের দিনে (তাঁর বিরোধীদের প্রতি) কুফর তথা অবিশ্বাসের দোষারোপ করে (শরীয়তের) নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করতে এক ব্যক্তিকে শুনেছিলেন। তিনি (রা.) তাঁকে বলেন, এমন কথা বলবেন না, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আমরা তাঁদের বিরোধিতা করেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি তাঁরা আমাদের বিরোধিতা করেছেন। (এরই দরুন যুদ্ধ বেধেছিল)।[৭৮]

[৭৮] তারীখু ইবনু আসাকির কামিল, ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, দামেশকীয় সংস্করণ, ১৩৭১ হিজরী/১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ; তাহযীবু ইবনু আসাকির, ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, সিফফীন যুদ্ধে নিহত শামদেশীয় যোদ্ধাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ বর্ণনাসমূহের অধ্যায়।

ইবনে তাইমিয়া আল-হার্রানী নিম্নলিখিত শব্দচয়নে একটি ইসনাদের মাধ্যমে মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ গ্রন্থ থেকে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন:

سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سمع علي يوم الجمل ويوم الصفين رجلا يغلو في القول فقال لا تقولوا إلا خيرا إنما هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم.

অর্থ: সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, যিনি বলেন:

হযরত আলী (ক.) জামালের দিনে এবং সিফফীনের দিনে এক ব্যক্তিকে সীমা অতিক্রম করতে শুনেছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁকে আদেশ করেছিলেন, "ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চারণ কোরো না। তাঁরা স্রেফ এমন একটি জাতি যাঁরা বিশ্বাস করেন যে আমরা তাঁদের বিরোধিতা করেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁরা আমাদের বিরোধিতা করেছেন, তাই আমরা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করেছি।"[৭৯]

আমরা এখন বাগী শব্দের এই অর্থটিকে প্রতিপাদন করবো এবং শিয়াবর্গের দ্বারা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত বইপত্রে জ্যেষ্ঠ শিয়াদের বর্ণনা হতে তা নিশ্চিত করবো, যাতে সুন্নী ও শিয়া উভয়েরই এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হয়।

جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لأهل حربه إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا و لكنا رأينا أنا على حق ورأوا أنهم على حق.

[৭৯] মিনহাজুস্ সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, এর শিরোনাম: 'পুণ্যবান পূর্বসূরীবৃন্দ বলেছেন আল্লাহ আদেশ করেছেন যেনো তাঁর কাছে উম্মতে মুহাম্মদী (দ.)-এর জন্যে ক্ষমা চাওয়া হয়, আর রাফেযী শিয়াচক্র তাঁদের প্রতি দিয়েছে লা'নত/অভিসম্পাত;' আল-মুনতাকা, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, মিসরীয় সংস্করণ, ১৩৭৪ হিজরী।

অর্থ: জা'ফর তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা সম্পর্কে বলতেন:

"আমরা তাঁদের প্রতি কাফের আখ্যা দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি না এবং তাঁদের দ্বারা আমাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়ার কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি না। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা সত্যের উপর আছি এবং তাঁরা নিশ্চিত যে তাঁরা সত্যের উপর রয়েছেন।"[৮০]

সারকথা হলো, সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্যের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যে, "আমাদের ভাইয়েরা" অর্থ "আমাদের ঈমানী ভাইয়েরা," এবং এখানে 'বাগী' শব্দটির ব্যবহারিক ভাষাগত অর্থ বোঝানো হয়েছে; মানে সীমা লঙ্ঘন করা, দাবি করা ইত্যাদি। এতে ইসতিলাহী (তথা শরঈ পরিভাষাগত) বাগাওয়াত/বিদ্রোহ শব্দটি বোঝানো হয় নি। উপরোক্ত বর্ণনাগুলোই এর প্রমাণবহ।

বাগাওয়াত-এর ইসতিলাহি (শরঈ পরিভাষাগত) অর্থ হলো, কারো দ্বারা তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কোনো হক্ক/ন্যায্য খেলাফতের বিরোধিতা করা। সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোনো খলীফার প্রতি বিদ্রোহী ছিলেন না, তবুও তিনি বলেছেন যে তাঁরা (শামদেশীয় মানুষ) বিশ্বাস করেন যে আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে বাগাওয়াত করেছি। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাগাওয়াত শব্দের ইসতিলাহী বা শরয়ী অর্থ বোঝানো হয় নি, বরং (ব্যবহারিক/প্রচলিত) ভাষাগত অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

[৮০] কুর্বুল ইসনাদ, ৪৫ পৃষ্ঠা, অন্যান্য প্রবন্ধসহ, ইরানী ছাপা, পুরোনো সংস্করণ।

"ঈদে গাদীর" রচনা সম্ভার

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

ঈদে গাদীর সম্পর্কে সুন্নী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে জাতীয়ভাবে ঈদে গাদীর পালিত হয় কি?

উত্তর: না, হয় না।

প্রশ্ন: কোন্ দেশে তা পালিত হয়?

উত্তর: ইরানে (রাফেযী শিয়াপন্থী)।

প্রশ্ন: তাহলে কারা ঈদে গাদীরের পক্ষে ওকালতি করছে?

উত্তর: রাফেযী শিয়াদের চামচা দল।

প্রশ্ন: হাদীসে কি বলা হয়নি জামা'আতকে অনুসরণ করো?

উত্তর: হ্যাঁ, কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ না করে বৃহত্তর মুসলিম জামা'আতকে অনুসরণ করার জন্যে বলা হয়েছে। যেমন, আদেশ দেয়া হয়েছে - يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ - "আল্লাহর সমর্থন জামা'আতের প্রতি"।[৮১] ইরান ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জাতীয় পর্যায়ে ঈদে গাদীর পালন করা হয় না। অথচ উপরে উল্লেখিত হাদীসটিতে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে এবং তা থেকে বিচ্যুত না হবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আমরা জানি বর্তমান ইরান শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যদিও ইতিপূর্বে এটা সুন্নীপ্রধান ছিলো; রাফেযী শিয়াপন্থী তুর্কমেন জাতিগোষ্ঠী পাহাড় থেকে নেমে এসে সুন্নী আলেম-উলামা, বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানীগুণীজনকে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নির্মূল করেছে এবং দেশটি জবরদখল করেছে। এই ঈদে গাদীর পালনের পেছনে রাফেযী শিয়াদের উদ্দেশ্য কী?

[৮১] সুনান আৎ তিরমিযী, ২১৬৬, হাদীসের মান - সহীহ।

উত্তরঃ রাফেযী শিয়াপন্থীদের মতানুযায়ী, গাদীরে খুমের ভাষণে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে খেলাফত/ইমামতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর বেসাল শরীফের পরে প্রথম তিন খলীফা সর্ব-হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, উমর ফারূক্ব ও উসমান যিন্নুরাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ষড়যন্ত্র করে খেলাফতের ভারগ্রহণ হতে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে বঞ্চিত করেন। তাই শিয়াপন্থী গোষ্ঠী ঈদে গাদীর পালনের অন্তরালে উক্ত তিন খলীফা (রা.)-কে অবৈধ ও অনৈসলামী হিসেবে প্রচার-প্রতিষ্ঠা করার গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নে অপতৎপর। এছাড়া, তারা একই তারিখে খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর শাহাদাত উপলক্ষে উল্লাস প্রকাশে মত্ত। এসব কাজ ইসলামের মূলোৎপাটনের দুরভিসন্ধি নিয়ে করা হচ্ছে। বস্তুতঃ খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা' ও তার সাবাইয়্যা গোষ্ঠীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী হলো আজকের রাফেযী শিয়াচক্র। তারা দাবি করে যে শাহাদাতে উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এরও ২৪ বছর আগেকার এই গাদীরে খুমের ঘটনা। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, ওই ২৪ বছরে তো কারো দ্বারা কোনো ঈদে গাদীর পালনের নজির নেই!

অতএব, হক্বপন্থী সুন্নী মুসলমানবৃন্দের এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কেননা পারস্যদেশীয় রাফেযী গোষ্ঠীর অঢেল সম্পদ তারা নিজেদের ভ্রান্ত মত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারে ব্যয় করছে। আমাদের দেশে ইতোমধ্যে অনেক অর্থলোভী আলেম ও দরবারি আওলাদকে কেনা গোলামে তারা পরিণত করেছে! এই সেবাদাসগুলো বর্তমানে ঘটা করে ঈদে গাদীর পালনের অপচেষ্টারত। মুসলমান সমাজকে এ থেকে পরহেজ করতে হবে, ঠিক যেমনিভাবে পরহেজ করেছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী সুন্নী আকাবের/বুযূর্গানে দ্বীন-মণ্ডলী।

গাদীরে খুমে হযরত আলী (ক.)-কে প্রদত্ত 'মওলা' উপাধি সম্পর্কে রাফেযী ব্যাখ্যা কী?

ইদানীং আমাদের দেশে অনলাইনে সক্রিয় রাফেযী শিয়া সদস্যবর্গ গাদীরে খুমে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে প্রদত্ত 'ওলী' বা 'মওলা' উপাধিটির ব্যাখ্যা নিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলছে, কিন্তু 'ওলী' বা 'মওলা' বলতে প্রকৃত অর্থে তারা কী বোঝাতে চাচ্ছে তা স্পষ্ট করে বলছে না। আমরা মুসলমান সর্বসাধারণের বোধগম্য হবার জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিচ্ছি। কেননা এই বিষয়টি চৌদ্দশ বছর আগেই আহলে বাইত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-মণ্ডলীর একজন সম্মানিত সদস্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; ওই সময় তিনি জনৈক রাফেযী শিয়ার অন্তরের গভীরে লালিত শিয়াপন্থীদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত বক্তব্যের জবাব দিচ্ছিলেন। চলুন, তিনি যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন তা জানা যাক।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)'এর নাতী হযরত ইমাম হাসান আল-মুসান্না (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-কে জানায় যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাদীরে খুমে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে 'মওলা' ঘোষণা করে আপন উত্তরাধিকারী খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন (এ বিবরণ তারীখুল দিমাশক গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত)। অতঃপর হযরত ইমাম হাসান মুসান্না (রহমতুল্লাহি আলাইহি) লোকটিকে বলেন:

أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا فما كان من رواء هذا شيء فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر كما تقولون إن الله ورسوله اختارا عليا لهذا الأمر والقيام بعد النبي عليه السلام إن كان لأعظم الناس في ذلك خطأة وجرما إذ ترك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه ، كما أمره أو يعذر فيه إلى الناس.

অর্থ: আল্লাহর কসম! যদি এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি খেলাফতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের একটি পদ প্রদানের ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করতেন; ঠিক যেমনটি তিনি স্পষ্টভাবে (শরঈ আদেশ) সালাত, যাকাত, রমজানের রোজা এবং হজ ইত্যাদি জারি করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'হে লোক সকল! এই ব্যক্তি (হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে উল্লেখ করে) আমার পরে তোমাদের ওলী তথা অভিভাবক, সুতরাং তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো।' এর পরে আর কোনো বিভেদ থাকতো না, কারণ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং বিবেচনাশীল ব্যক্তিত্ব। যদি তোমার (মানে শিয়া লোকটির) মত হয় এই যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে এ ঘোষণার দ্বারা খলীফা মনোনীত করা হয়েছিলো, তাহলে তিনি (মানে হযরত আলী-ক.) সমস্ত লোকের মধ্যে সবচেয়ে ত্রুটিযুক্ত হতেন; কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর এ আদেশ পালন করেননি।[৮২]

অতএব, আমরা দেখতে পেলাম যে আহলে বাইত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের সম্মানিত একজন সদস্য চৌদ্দ শ বছর আগেই শিয়াদের বক্র অন্তরে লালিত চিন্তার সমুচিত জবাব দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এ দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের (মানে সুন্নীদের) পথ চলতে হবে। তাঁর কথার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা আমাদের উচিত হবে না। কেননা তিনি ভেড়ার লোমের আড়ালে লুকোনো নেকড়ের থাবা আমাদের চেয়ে ঢের ভালো দেখতে পেয়েছিলেন (যা বর্তমানে নির্বোধ কিছু মুসলমান দেখতে পাচ্ছে না)। বস্তুতঃ আহলে বাইত ও আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)-মণ্ডলীকে মান্য করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তাই হযরত হাসান মুসান্না (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই দিকনির্দেশনাকে আমাদের মোটেও অবহেলা করা উচিত হবে না।

---

[৮২] তাবাকাত ইবনে সা'দ, ৭/৩১৪-৩১৫; তারীখু ইবনু আসাকির, ৪/১৬৬; আল-বায়হাকী রচিত 'আল-ই'তিকাদ, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, সহীহ সনদ-সহ; মুহাম্মদ ইবনে আসিম আল-আসবাহানী তাঁর জুয-এ, # ১২৬।

খেলাফত ও বেলায়াত

আল্লাহতায়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ: এবং স্মরণ করুন (হে রাসূল), যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বল্লেন, 'আমি পৃথিবীতে আপন খলীফা/প্রতিনিধি সৃষ্টিকারী।' (তারা) বল্লো, 'আপনি কি এমন কোনো সৃষ্টিকে খলীফা/প্রতিনিধি করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আর আমরা আপনার প্রশংসাপূর্বক আপনার তাসবীহ (স্তুতিগান) করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বল্লেন, 'আমার জানা আছে যা তোমরা জানো না।'[৮৩]

ওপরের আয়াতে উল্লেখিত খলীফা প্রেরণের প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয় পয়গাম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম) দ্বারা এবং এর চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে আমাদের প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দিয়ে। কেননা তিনি একটি হাদীসে ঘোষণা করেন:

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

অর্থ: এবং নিশ্চয় আমিই সর্বশেষ পয়গাম্বর, আমার পরে কোনো নবী আসবেন না।[৮৪]

এই নুবূয়্যতের ক্রমধারা সুসম্পন্ন হওয়ার পরে বেলায়াত (ওলীত্ব)-এর ক্রমধারা আরম্ভ হয়েছে এবং জারি রয়েছে; আর তা জারি থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। তবে তা খুলাফায়ে রাশেদীন তথা সঠিক পথপ্রাপ্ত চার খলীফা

---

[৮৩] আল-কুর'আন, ২:৩০; নূরুল ইরফান।

[৮৪] আবূ দাউদ ৪২৫২, তিরমিযী ২২০২, ইবনে মাজাহ ৩৯৫২, মুসনাদে আহমদ ১৬৯৫৬, আল-বুখারী ৭১, মুসলিম ১৭৬ - (১৯২৪), ইবনে হিব্বান ৬৮৩৬, নাসাঈ ৮৭১২।

(রা.)-কে দিয়েই সূচিত হয়। যেমন, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেন:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.

অর্থ: অতঃপর তোমাদের প্রতি বিধেয়/পরিপালনীয় হলো আমার সুন্নাত (রীতি/পদ্ধতি) ও হেদায়াতের পথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দের সুন্নাত।[৮৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, হেদায়াতের পথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তাঁদের মধ্যে কোনো বিশেষ একজনকে উদ্দেশ্য করেনি। আর সুন্নাত শব্দটি ফিক্বহী অর্থে তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবকে ও তাসাউফের অর্থে নিজ নিজ তরীক্বতকে বুঝিয়েছে।

বিশিষ্ট ইসলামী আলেম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহেলভী (রহ.) নিজের লেখা 'ইযালা'তুল খাফা' পুস্তকে লেখেন:

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হেদায়াত দানের কাজটি ছিলো তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বলবৎ করার দায়িত্ব। এর নাম 'সালতানাত।' দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মুসলমানদের মাঝে শিক্ষাদান (ফিক্বাহ)। তৃতীয় কাজটি যার নাম 'ইহসান,' তা ছিলো অন্তরসমূহকে পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব। খুলাফায়ে রাশেদীন এই তিনটি দায়িত্ব (সুচারুরূপে) পালন করেন। (রাজ্য শাসনে) তাঁদের উত্তরসূরীবৃন্দ শুধু সালতানাতের দায়িত্বই পালন করতে সক্ষম হন। শরীয়তের (ফিক্বাহ) শিক্ষাদানের দায়িত্ব মাযহাবের ইমামবৃন্দের কাঁধে ন্যস্ত হয় এবং 'ইহসানের' দায়িত্বভার অর্পিত হয় তাসাউফ/তরীক্বতের মহান মাশায়েখ-মণ্ডলীর প্রতি।"[৮৬]

শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবের আলোচনার আলোকে আমরা জানতে পারি যে, চার খলীফা (রা.)-এর খেলাফত ছিলো রাজ্য শাসন, শরঈ জ্ঞান শিক্ষাদান

[৮৫] আবূ দাউদ ৪৬০৭; তিরমিযী ২৬৬; ইমাম নববী (রহ.)'এর চল্লিশ হাদীস পুস্তকে ২৮ নং হাদীস; হাদীসের মান - হাসান সহীহ।

[৮৬] ইযালা'তুল খাফা আন্ খিলাফাতিল খুলাফা, ৩৪২ পৃষ্ঠা; এ উদ্ধৃতিটি আল্লামা হুসাইন হিলমী তুর্কী (রহ.)-এর 'ইসলামে ধর্ম সংস্কারক' বইটি থেকে নেয়া;

ও বেলায়াত তথা তাসাউফ-তরীক্বতের দীক্ষাদানের সমষ্টি। এর সূচনা হয় হযরতে সিদ্দীক্বে আকবর সৈয়্যদুনা আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর খেলাফত দ্বারা। সে সময় সমস্ত আহলে বাইত (রা.) ও আসহাব (রা.) তাঁর খেলাফত তথা বেলায়াতের আনুগত্য স্বীকার করেন। এরপর হযরতে ফারূক্বে আজম সৈয়্যদুনা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতের প্রতি সবাই আনুগত্য স্বীকার করেন। অতঃপর হযরতে যিন্নুরাইন সৈয়্যদুনা উসমান ইবনে আফফান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত এবং সবশেষে হযরতে সৈয়্যদুনা মওলা আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর খেলাফত সবার প্রতি জারি হয়। এ সকল খলীফা (রা.) তাঁদের নিজ নিজ সময়কালে রূহানী ফয়েয বিচ্ছুরণ করে সবার অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও আলোকিত করেন।

খলীফা (রা.)-বৃন্দের ফয়েযপ্রাপ্ত হয়ে অন্যান্য সাহাবা (রা.)-ও আপন আপন মাযহাব ও তরীক্বত প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োজিত হন। কিন্তু সময়ের পরিক্রমণে তাঁদের ফিক্বাহ'র মাযহাব ও তাসাউফ-তরীক্বত বিস্মৃত হয়। হয়তো কারো কারো তরীক্বত পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কোথাও না কোথাও আজো জারি আছে, তবে হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সূত্রে অধিকাংশ তরীক্বতের সিলসিলা বর্তমান জগতে জারি হয়েছে। খলীফা আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সূত্রেও কিছু সিলসিলা এখনো আছে, আরো আছে হযরতে ওয়াইস ক্বরণী (রহমতুল্লাহ আলাইহি)'এর সূত্রে তরীক্বতের সিলসিলা। শেষ কথা হলো, সমস্ত সিলসিলা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত জানি না। অতএব, এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

ইসলামী খলীফা (রা.)-বৃন্দের সবাই কি বাতেনী পূর্ণতাপ্রাপ্ত নন?

এদেশের সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা বদ্ধমূল। নিশ্চয় এটা বহু বছরের শিয়া অপচেষ্টার ফসল এ মর্মে যে তারা নিজেদের বইপত্রে, বিশেষ করে তাসাউফ-তরীক্বতবিষয়ক বইপত্রে চার খলীফার মধ্যে প্রথম তিনজনকে স্রেফ রাজ্য-শাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছে; এ যেনো তাঁরা আধ্যাত্মিকতার কোনো দীক্ষাই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে পাননি। এর চেয়ে বেশি অসত্য আর কোনো কিছু হতে

পারে না! কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ.

অর্থ: অতঃপর তোমাদের প্রতি বিধেয়/পরিপালনীয় হলো আমার সুন্নাত (রীতি/পদ্ধতি) ও হেদায়াতের পথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দের সুন্নাত।[৮৭]

এখানে লক্ষণীয় যে, হেদায়াতের পথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তাঁদের মধ্যে কোনো বিশেষ একজনকে উদ্দেশ্য করেনি। আর সুন্নাত শব্দটি ফিক্বহী অর্থে তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবকে ও তাসাউফের অর্থে নিজ নিজ তরীক্বতকে বুঝিয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, খলীফা (রা.)-বৃন্দ হলেন - الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ - হেদায়াতের পথপ্রাপ্ত। আমাদের প্রশ্ন: ইসলামের যাহেরী/প্রকাশ্য বিধিবিধানগত শিক্ষা ও বাতেনী/আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দীক্ষা ছাড়া কি হেদায়াতের পথ বিরাজমান থাকতে পারে? তাও আবার পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তা দ্বারা নেতৃত্ব দেয়ার বেলায়? আফসোস, এসব ব্যাপারে আজকের মুসলমান সমাজ প্রায় বে-খবর। দুনিয়া অন্বেষণের সময় সমস্ত গবেষণা করা গেলেও আখেরাতের প্রশ্নে চরম অজ্ঞতাই এখন সার!

সবার জ্ঞাতার্থে আমরা খলীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের কিছু কারামতের বর্ণনা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করবো। এগুলো বিভিন্ন ইসলামী বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে:

১. খলীফা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বেসাল হওয়ার আগে অসীয়ত/উইল করেন যে হযরত আয়েশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সন্তানদেরকে লালন-পালন করবেন। তিনি তাঁকে বলেন, "আমার পুত্র ও দুই কন্যাকে তোমার কাছে রেখে গেলাম।" অথচ তখন কন্যাদের মধ্যে কেবল হযরত আসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-ই রয়েছেন। মা আয়েশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু

[৮৭] আবূ দাউদ ৪৬০৭; তিরমিযী ২৬৬; ইমাম নববী (রহ.)'এর চল্লিশ হাদীস পুস্তকে ২৮ নং হাদীস; হাদীসের মান - হাসান সহীহ।

আনহা) খলীফা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, "আমার শুধু একজন বোন, অপরজন কে?" খলীফা (রা.) উত্তর দেন, "আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। মনে হয় বাচ্চাটি মেয়ে হবে।" ঠিকই তাঁর বেসালপ্রাপ্তির পরে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। [শওয়াহিদুন্ নুবূওয়া গ্রন্থ]

২. মুসলমান সেনাবাহিনি হযরত সারিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর অধিনায়কত্বে পারসিকদের মুখোমুখি হন খলীফা উমর ফারূক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে। পারসিক বাহিনি ছিলো বিশাল। তাদের সাথে মুসলমানবৃন্দ এঁটে উঠছিলেন না। ঠিক সেই সময় খলীফা (রা.) মদীনায় মসজিদে নববীর মিম্বরে উঠে জুমুআ'র খুতবা পাঠ করছিলেন। কাশফ/দিব্যদৃষ্টিতে মুসলমান বাহিনির নাজুক অবস্থা দেখতে পেয়ে তিনি উচ্চস্বরে বলেন, "হে সারিয়া! (পেছনের) পাহাড়! পাহাড়টি দখল করো!" উপস্থিত জামা'আত খুতবার মাঝখানে এ কথাটির মর্ম বুঝতে না পারলেও হযরত সারিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সেনাদল ঠিকই শুনতে পান। তাঁরা পেছনের পাহাড়টি দখল করার পরে শত্রুর দুর্বল স্থানগুলো ওপর থেকে দেখে তাতে আঘাত হানেন। ফলশ্রুতিতে বিশাল পারসিক বাহিনি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে।

৩. খলীফা উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যেদিন সকালে শহীদ হন, তার আগের রাতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখেন, যিনি তাঁকে বলেন, "হে উসমান! (আজ) রোযা রাখো যাতে সন্ধ্যায় তুমি আমাদের সাথে ইফতার করতে পারো।" সেই দিনটিতে তিনি মোনাফিক্বদের দ্বারা শহীদ হন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক যোগাযোগ না থাকলে এটা হতো না।

৪. খলীফা আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বেসালপ্রাপ্তির সময় পুত্র ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে বলেন, "আমার খাটিয়াকে আরনাঈন নামের একটি জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি একটা সাদা ঝকঝকে পাথর দেখবে। সেখানেই আমাকে

দাফন করবে।" তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী তাঁরা সেখানে যেয়ে ঠিকই ঝকঝকে সাদা পাথর দেখতে পান এবং তাঁকে দাফন করেন।

শেষ কথা: ইসলাম হলো আদবশীলতার ধর্ম। বেয়াদবের জন্য খোদা নেই। আমাদের এমন কোনো কথা বলা উচিত নয়, যা দ্বারা বুযূর্গানে দ্বীনের মান-মর্যাদা খাটো হয়। হাকীকত না জেনে খলীফা (রা.)-মণ্ডলীর কাউকে অন্যান্যদের চেয়ে বড় করে প্রদর্শন করার চেষ্টা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হবে। ওই হাকীকত কুর'আন ও হাদীসে যতোখানি ব্যক্ত হয়েছে শুধু ততোটুকুই আমরা বিশ্বাস করি। সুন্নী জামা'আতের আক্বীদা-বিশ্বাস হলো আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর পরে আহলে বাইত (রা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উম্মতের মাঝে সেরা, আর চার খলীফা (রা.) সেই সেরাদের সেরা! অতএব, তাঁদের চারজনের ব্যাপারে কথা বলার সময় আমাদের সতর্ক হতে হবে।

রাফেযী শিয়াচক্রের একটি ভুয়া দাবি

রাফেযী গোষ্ঠী আরেকটি ভুয়া দাবি উত্থাপন করে যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক গাদীরে খুমে প্রদত্ত ভাষণ শেষ হলে নিম্নোক্ত আয়াতে করীমাটি অবতীর্ণ হয়:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا.

অর্থ: আজ আমি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।[৮৮]

শিয়াচক্র দাবি করে যে, গাদীরে খুমে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে দ্বীনকে পূর্ণতাদানের খাতিরে এই আয়াতটি নাযেল হয়েছিলো। অথচ আরাফাতের পাহাড়ে প্রদত্ত বিদায়ী হজ্জের ভাষণশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যেমন -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ أَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا). قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

---

[৮৮] আল-কুর'আন, ৫/৩; নূরুল ইরফান।

অর্থ: হাসান ইবনুস সাব্বাহ্ (রহ.) ... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহূদী তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহূদী জাতির প্রতি নাযিল হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা সে দিনটিকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি (খলীফা) বললেন, কোন্ আয়াতটি? ইহুদী উত্তর দিলেন -

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.

"আজ আমি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম"।[৮৯] খলীফা 'উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এটি যে দিন এবং যে স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিল/অবতীর্ণ হয়েছিলো তা আমরা জানি; তিনি সেদিন 'আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম'আর দিন।[৯০]

অতএব, স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে রাফেযী-চক্র ধর্ম নিয়ে তামাশায় মেতেছে। মিথ্যের বেসাতি-ই তাদের একমাত্র সম্বল।[৯১]

[৮৯] আল-কুর'আন, ৫/৩।
[৯০] আল-বুখারী-৪৫, মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থ; এই হাদীসের মান - সহীহ।
[৯১] সৌজন্যে: www.mahajjah.com

গাদীরে খুমে খেলাফত/ইমামত মঞ্জুর হয়নি মর্মে হযরত আলী (ক.)'এর সমর্থনসূচক ভাষ্য

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায়ী হজ্জ থেকে মদীনা মোনাওয়ারায় ফেরার পথে গাদীরে খুম স্থানটিতে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে 'মওলা' উপাধি দান করেন। এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা 'সুন্নী দৃষ্টিকোণ হতে গাদীরে খুম-সংক্রান্ত হাদীসের বিশ্লেষণ' শীর্ষক বইটিতে পেশ করেছি (২০১৯ সালে প্রকাশিত)। ভ্রান্ত শিয়াপন্থী গোষ্ঠী এটা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে; তারা দাবি করে এ ঘটনায় হযরতে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কেই সর্বপ্রথম খলীফা বা ইমামের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)'এর ভাষ্য কী? তিনি অথবা অন্যান্য সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-মণ্ডলী এ বিষয়ে কী বলেন, চলুন তা জানতে চেষ্টা করি।

ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আয্-যুহরী হতে ইসনাদের সূত্রে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ ـ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رضى الله عنه ـ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَاللهِ لأُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

অর্থ: ইসহাক (রহ.) ... আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইবনু আবী তালীব (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ হতে বের হয়ে আসেন যখন তিনি শেষ অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূল হাসান (ক.), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল্-হামদুলিল্লাহ্, তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন হযরত আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি তিন দিন পরে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রোগে অচিরেই বেসাল (আল্লাহর সাথে পরলোকে মিলন)-প্রাপ্ত হবেন। কেননা আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের অনেকের মৃত্যুকালীন চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। চলো যাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (খিলাফতের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানবো। আর যদি আমাদের ছাড়া অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারবো এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদের তখন অসীয়ত করে যাবেন। তখন হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বললেন, আল্লাহর কসম, যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমরা জিজ্ঞাসা করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন (মানে খেলাফত মঞ্জুর না করেন), তাহলে এরপর লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবেন না। আল্লাহর কসম, এজন্য আমি কখনোই এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করবো না।[৯২]

[৯২] সহীহ বুখারী, ৪৪৪৭।

আমাদের (সুন্নীদের) প্রশ্ন: হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) যদি গাদীরে খুমে স্পষ্টভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন, তাহলে কেনো হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফত সম্পর্কে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করার কথা নিয়ে ভাবতে যাবেন? কেননা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তো তাঁর (খেলাফতের) উত্তরাধিকারের নির্দেশ (গাদীরে খুমে) দেওয়াই হয়েছিলো বলে শিয়াদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়! অধিকন্তু, কেনোই বা হযরত 'আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হযরত 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সংশোধন করে দেননি এ কথা স্বীকার করে যে তিনিই গাদীরে খুমে খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন? আর কেনোই বা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক তাঁর প্রতি খিলাফত মঞ্জুর না করার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যদি তিনি ইতিমধ্যেই খলীফা নিযুক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন? হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, তিনি স্বয়ং কখনো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা খলীফা নিযুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে বিবেচনায়ই নেন নি।[৯৩]

[৯৩] সৌজন্যে: www.mahajjah.com

গাদীরে খুমে মওলা আলী (ক.)-এর বেলায়াতের অভিষেক হয়নি, হয়েছে কুর'আনের মক্কী সূরায়

শিয়াচক্র বেহুদা তর্কাতর্কি করতে পছন্দ করে। গাদীরে খুমে ঘোষিত হাদীসটির চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ করার পরও তারা তা মানতে নারাজ। আমরা যা লিখেছি শরঈ দলিলভিত্তিক, আর তা পূর্ববর্তী ভুল ধারণার মূলোৎপাটনকারীও। সম্ভব হলে কুর'আন ও হাদীসের দলিলকে খণ্ডন করুন!

মহাভ্রান্ত শিয়াচক্র দাবি করে যে গাদীরে খুমে 'মওলার (বেলায়াতের) অভিষেক' হয়েছে। অথচ হাদীসে উক্ত মওলা শব্দটি একজন প্রিয়ভাজন বন্ধুকে বুঝিয়েছে, মুসলিম সাধারণের (বেলায়াতের) অভিভাবক বোঝায় নি। যদি তাই হতো, তাহলে জ্যেষ্ঠ সাহাবা (রা.)-বৃন্দ, বিশেষ করে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বাইত-সদস্য ও শ্রদ্ধেয় চাচাজান দু জন সর্ব-হযরত আমীরে হামযা ও আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রমুখ ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর অভিভাবকত্বের অধীন হতেন। এটা শ্রেফ এক জঘন্য বেয়াদবি! শিয়াদের পথভ্রষ্ট মতবাদে এ বেয়াদবি থাকলেও আমাদের সুন্নী মতাদর্শে এর কোনো স্থান নেই। হযরতে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হস্তপদ মোবারক চুম্বন করতেন (ইমাম বুখারী কৃত 'আদাবুল মুফরাদ')।

সূরাহ ইউনুস, ৬২ আয়াতে আল্লাহ বলেন -

أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ.

"নিশ্চয় আল্লাহর আউলিয়াবৃন্দের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা সন্তাপগ্রস্তও হবেন না" [সরাসরি অনুবাদ]। আউলিয়া শব্দটি বহুবচন। আর কুর'আনের এই আয়াত যখন নাযিল হয় (মক্কী সূরাহ, ডঃ তাহিরুল কাদরী কৃত ইরফানুল কুর'আন, বাংলা সংস্করণ), তখন সাহাবা (রা.)-বৃন্দের প্রজন্মকেই এতে প্রথমতঃ উদ্দেশ্য করা হয়েছিলো। গাদীরে খুমের ঘটনা

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবূয়্যতের মিশনের শেষ দিকে সংঘটিত হয় (বিদায়ী হজ্জশেষে মদীনা ফেরার পথে)। অতএব, বেলায়াত তথা ওলীত্ব ইতিমধ্যে আল্লাহতায়ালা দান করেছেন সাহাবা (রা.)-বৃন্দের অনেককেই, যাঁদের মধ্যে হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ও রয়েছেন। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, অনেক সাহাবা (রা.)-এর তরীকতের সিলসিলা পরবর্তীকালে জারি থাকেনি, ঠিক যেমনিভাবে তাঁদের মাযহাবও জারি থাকেনি। মাযহাবের ক্ষেত্রে চার ইমামের (রহ.)-গুলোই জারি হয়েছে। একইভাবে সিলসিলার ক্ষেত্রেও হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) হতে বেশির ভাগ তরীকাহ আবির্ভূত হয়েছে। তবে তরীকার ইমাম (রহ.)-বৃন্দের স্ব স্ব নামে তা জারি রয়েছে।

ফেসবুকে প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন

জনৈক ফেসবুকার আমার 'মওলা আলী (ক.)-এর বেলায়াতের অভিষেক গাদীরে খুমে হয়নি, হয়েছে কুর'আনের মক্কী সূরায়' শীর্ষক পোস্টের মন্তব্য ফোরামে এসে প্রশ্ন করেছেন: "এটার (মানে আমার প্রদর্শিত ওই ১০/৬২ আয়াতটির) দ্বারা কি আলী (রা.)-এর খিলাফত প্রমাণিত হয়? রাসুলুল্লাহ (স.) হযরত আলী (রা)-কে খেলাফত দিয়ে গেছিলেন-

إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي.

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। আমার পরে সে-ই হবে সমস্ত মুমিনের অভিভাবক। [সুনানে তিরমিজি/হাদীস-৩৭১২]"

আমার জবাব

এর সমুচিত জবাব নিচের সাইটে বিদ্যমান। সংক্ষেপে বলবো, হাদীসের - بعدي - তথা "আমার পরে" সংযোজিত অংশটুকু শিয়াদের; এর মানে

এটা মূল বর্ণনায় নেই। হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কে শিয়াপন্থীদের আরো জানা জরুরি।[৯৪]

কুর'আন মজীদ ৫/৫৫ ঘোষণা করে -

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.

নিশ্চয় তোমাদের ওলী/বন্ধু (وَلِيُّكُمُ) তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারবৃন্দ -যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহরই সামনে বিনত হয় (আয়াতে করীমা)। এই আয়াতে 'বন্ধু' শব্দটি সম্পর্কে টীকা লিখতে গিয়ে হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "এখানে ওলী তথা 'বন্ধু' মানে 'খলীফা' হতে পারে না; আর না এ আয়াত হযরত আলী মুরতাদা (রা.)-এর খিলাফতের জন্যে খাস্ হতে পারে। এর কয়েকটা কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে - আল্লাহ ও রাসূল (দ.) কারো খলীফা নন। অথচ এখানে আল্লাহ ও রাসূলকে 'ওলী' (ولى) বলা হয়েছে। একটা শব্দ একই সময়ে কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় হযরত আলী (ক.) খলীফা ছিলেন না। যদি আয়াতে হুজূরের (দ.) পরবর্তী জমানাও বোঝানো হয়, তবে মাঝখানে বিরতি ছাড়া সরাসরি (بلا فصل) খিলাফত প্রমাণিত হয় না। প্রথম তিন খলীফার পরও তো 'পরবর্তী জমানা।' তৃতীয়তঃ - إِنَّمَا - শব্দটি হাস্‌সুন (حص)-এর জন্যে (অর্থাৎ নির্ধারিত বস্তুর নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্যে) ব্যবহৃত। যদি 'খিলাফত' হযরত আলী (ক.)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তবে (শিয়াদের বারো ইমামের) বাকি এগারোজন

[৯৪] সাইট লিঙ্ক: https://www.twelvershia.net/.../response-to-alee-a-s-the.../

ইমামের খিলাফতও তো বাতিল হয়ে যায়! মোট কথা, এখানে 'ওলী' (ولى) মানে হয়তো 'বন্ধু;' নতুবা 'সাহায্যকারী।'[৯৫]

ইবনু সা'আদ বর্ণনা করেন ইমাম হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (রহ.) ও এক রাফেযীর মধ্যকার কথপোকথন:

فقال له الرافضي ألم يقل رسول الله عليه السلام لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال أما والله أن لو يعني بذلك الامرة والسلطان لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم أيها الناس هذا وليكم من بعدي.

অর্থ: রাফেযী বল্লো, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি আলী (ক.)-কে বলেননি: "আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা?" তিনি (মানে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব) বললেন: "আল্লাহর কসম, যদি তিনি (দ.) এর দ্বারা নেতৃত্ব বোঝাতেন, তাহলে অবশ্যই তা স্পষ্ট করতেন, যেমন তিনি সালাত, যাকাত, রমজানের রোজা এবং কা'বা ঘরের হজ্জের বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন। বরং তিনি বলতেন: 'হে মানুষ, আমার পরে এই ব্যক্তিই তোমাদের ওলী (অভিভাবক)'।"[৯৬]

অতএব, এই সম্মানিত আহলে বাইত-সদস্য কর্তৃক শিয়াদের ভ্রান্ত দাবির মূলোৎপাটনেই বোধগম্য হয় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত কথা দ্বারা খেলাফতকে উদ্দেশ্য করেন নি। খেলাফত সুন্নী মুসলমানবৃন্দের চার খলীফা (রা.)-এরই ক্রমধারা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

[৯৫] তাফসীরে নূরুল ইরফান, টীকা- ১৭৪।
[৯৬] তাবাক্বাতে ইবনে সা'আদ, ৭ম খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা।

রাফেযী-চক্রের ধোঁকা ভঞ্জন

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর আহলে বায়ত তথা পরিবারসদস্যবৃন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন তাঁর জামাতা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু), কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরতে ফাতিমাতুয্ যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও দুই দৌহিত্র সর্ব-ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)। তাঁরা আমাদের মতো উম্মত সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ও শিরোমণি। কিন্তু তাঁদের দোহাই দিয়ে একটি মহাভ্রান্ত দুষ্টচক্র ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত। জি, এরা রাফেযী শিয়া গোষ্ঠী। আখড়া ইরানে হলেও বর্তমানে পেট্রো-ডলারের জোরে আমাদের দেশেও অনেক রাফেযী শিয়া তলপিবাহক পয়দা করা হয়েছে। সম্প্রতি পবিত্র মুহর্রম উপলক্ষে চামচারা বেশ কিছু অপযুক্তি দাঁড় করিয়েছে যেগুলো শরীয়তের দলিলভিত্তিক তো নয়ই, বরং ইসলাম-বিকৃতির পর্যায়ভুক্ত। কোনো ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়কে সাবেত বা প্রমাণ করতে হলে অবশ্যঅবশ্য শরীয়তের দলিল প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক। এটাকে 'মোল্লা দৃষ্টিভঙ্গি' বলে উপহাস করা ধর্ম নিয়ে তামাশা করারই সামিল।

অপযুক্তি:

আহলে বায়ত (রা:)'এর মর্যাদা এতো উচ্চে যে আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমিস্ সালাম)-ও তাঁদের সমকক্ষ নন! এ কথাই রাফেযী-চক্র ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ পাক তাঁর ঐশীগ্রন্থে ঘোষণা করেন:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقاً.

অর্থ: এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল (দ:)'এর হুকুম মানে, তবে সে তাঁদেরই সঙ্গ লাভ করবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন - অর্থাৎ

পয়গাম্বরবৃন্দ, সিদ্দীক্ব (সত্যনিষ্ঠ)-মণ্ডলী, শহীদান ও সৎকর্মপরায়ণ (সালেহীন)-বৃন্দ।[৯৭]

আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)'বৃন্দের সমমর্যাদা কোনো উম্মতেরই হবে না। দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছেন সিদ্দীক্বীন, যাঁদের প্রথম জন হলেন খলীফা হযরতে আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); দ্বিতীয় জন খলীফা হযরতে উমর ফারূক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); তৃতীয় জন খলীফা হযরতে উসমান যিন্নুরাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এবং চতুর্থ জন খলীফা হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)। বলা বাহুল্য যে, হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-ই আহলে বায়ত-প্রধান। অর্থাৎ, তাঁর মাধ্যমে নবী-বংশ জারি থেকেছে। তিনি কী বলছেন শুনুন:

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث.

অর্থ: প্রিয়নবী (দ)'এর পরে এই উম্মতের মাঝে সেরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা); অতঃপর সেরা হলেন হযরত উমর (রা); আর আমি যদি চাইতাম, তবে তৃতীয় জনের (নাম) উল্লেখ করতাম।[৯৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন:

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.

আমরা এ কথা প্রিয়নবী (দ)'এর (যাহেরী) হায়াতে জিন্দেগীতে বলতাম: "প্রিয়নবী (দ)'এর পরে এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন হয়রত আবূ বকর (রা); এরপর হয়রত উমর (রা); এরপর হযরত উসমান (রা); এরপর

[৯৭] সূরা নিসা, ৬৯ আয়াত; নূরুল এরফান।

[৯৮] বড়পীর সাহেব ক্বেবলা (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'এর শিষ্য ইমাম ইবনে কুদামা মাক্বদিসী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'লুম'আতুল ই'তিক্বা'দ' পুস্তিকা; খলীফাবৃন্দের মাহাত্ম্য অধ্যায়।

হযরত আলী (রা)।” রাসূলুল্লাহ (দ) কখনোই এ কথাকে নিষেধ করেননি।[৯৯]

ওপরের দুটো রওয়ায়াত/বর্ণনা থেকে উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট জানতে ও বুঝতে পারি। আর সবার বেহেশতে প্রবেশের প্রশ্নে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি: মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পবিত্র স্থানে শায়িত আছেন, তাকে কী বলা হয়? রিয়াজুল জান্নাহ নয় কি? মানে বোঝেন রাফিদাহ শিয়া গোষ্ঠী? এর অর্থ জান্নাতের বাগানের (অংশ)। সেখানে আর কে কে শায়িত আছেন জানেন কি? উত্তর - প্রথম দু জন খলীফা সর্ব-হযরত আবূ বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)! তাঁরা তো তাহলে ইতোমধ্যেই জান্নাতে অবস্থান করছেন! বস্তুতঃ কুরআন মজীদে সকল আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)’কে নাজাতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। আল্লাহতা’লাই এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাঁরা শিয়াদের বানোয়াট জাল সার্টিফিকেটের মুখাপেক্ষী নন! তবে আমরা পরবর্তীকালের সাধারণ উম্মত আহলে বায়ত ও আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-মণ্ডলীর শাফা’আতের প্রার্থী।

রাফেযী শিয়াচক্র সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সেগুলো এখানে উদ্ধৃত হলো:

হযরত মাওলা আলী (কঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার পর খুব শীঘ্রই এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, লোকেরা যাকে “রাফেজী” বলে ডাকবে। তোমরা যদি তাদের সাক্ষাৎ পাও তবে তাদেরকে হত্যা করবে। কেননা তারা মুশরিক ও মুনাফিক হবে। হযরত মওলা আলী (কঃ) এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে আলী! তারা অতিরঞ্জিত করে তোমার নামে এমন সব গুণের প্রচার করবে যা তোমার ভেতরে নেই। তারা পূর্ববর্তী বুজুর্গদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে এবং তাঁদের সমালোচনা করবে।

---

[৯৯] আল-বুখারী (রহ) কৃত ‘মানা’ক্বিব, ৩৪৬৮; সুনানে আবী দাউদ (রহ), কিতা’বুস্ সুন্নাহ, ৪৬২৭, ৪৬২৮, ৪৬২৯; ইবনে মাজাহ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ), ‘মোক্বাদ্দমা’, ১০৬; সুনানে তিরমিযী (রহ), ‘মানা’ক্বিব’, ৩৭০৭ এবং ইমাম আহমদ (রহ), ১:১১৪; ইমাম তিরমিযী (রহ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَهُمْ نَبْزٌ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ.

অর্থ: অচিরেই চিহ্নধারী এমন এক দলের উদ্ভব ঘটবে যাদেরকে রাফিদ্বা (রাফেজী) বলা হবে। যখনই তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, কেননা তারা নিশ্চিত মুশরিক।[১০০]

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন:

يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ فِي الْجَنَّةِ، أَنْتَ وَشِيعَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّكَ أَقْوَامٌ يُضْفَزُونَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ يَلْفِظُونَهُ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، لَهُمْ نَبْزٌ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَجَاهِدْهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَلَامَةُ فِيهِمْ؟ قَالَ: «لَا يَشْهَدُونَ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً، وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ الْأَوَّلِ.

অর্থ: হে আলী! তুমি আর তোমার সহচরবৃন্দ জান্নাতি, তুমি আর তোমার দল জান্নাতি। কিন্তু তারা ব্যতিরেকে যারা তোমাকে ভালোবাসার দাবি করে, ইসলামে সংযুক্ত থাকে আর মুখে উচ্চারণ করে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করে অথচ কণ্ঠনালিতে পৌঁছায় না। তাদের উপাধি রয়েছে, যাদেরকে রাফিদ্বা (রাফেজী) বলা হবে। তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা তারা নিশ্চিত মুশরিক। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের নিদর্শন কী? আল্লাহর রাসূল বললেন, তারা জুমআ ও জামাআত প্রত্যক্ষ করবে না। সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করবে।[১০১]

---

[১০০] (ক) আবু নুয়াইম ইস্পাহানি: হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩২৯। (খ) কাজী খাঁন: কানযুল উম্মাল, ১/২২৩। (গ) মোল্লা আলী কারী: শাম্মুল আওয়ারিদ্ব ফি যাম্মির রাওয়াফিদ্ব, ১/৬৯।
[১০১] তাবরানী: আল-মু’জামুল আওসাত, ৬/৩৫৪, হাদীস নং: ৬৬০৫।

يَأْتِي قَوْمٌ بَعْدَنَا يَنْتَحِلُونَ شِيعَتَنَا وَلَيْسُوا بِشِيعَتِنَا، لَهُمْ نَبَزُوا آيَةً، ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشْتِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ.

অর্থ: আমাদের পরে এমন এক দলের উদ্ভব ঘটবে যারা আমাদের ছদ্মবেশধারী অথচ আমাদের দলভুক্ত নয়। তারা আয়াত পরিবর্তন করবে। এমন যে, তারা আবু বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'কে গালমন্দ করবে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, কেননা তারা মুশরিক।[১০২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ نَبَزٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُون.

অর্থ: আমি নবী কারীম (দ.)'এর সান্নিধ্যে ছিলাম, তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন হযরত আলী (রা.)। হুযুর (দ.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আলী! অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে আহলুল বায়তের (পরিবারসদস্যবৃন্দের) ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করবে এমন একটি দলের উদ্ভব হবে। তাদের কিছু নিদর্শন থাকবে, যাদেরকে রাফিদ্বা (রাফেজী) বলা হবে। তোমরা তাদেরকে হত্যা কোরো, কেননা তারা মুশরিক।[১০৩]

আমরা এই চরম সতর্কবাণী সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করলাম। কিন্তু এই উম্মত (খাস করে আহলে বায়ত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বনী ইসরাঈল বংশীয় নবী বা রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম)'বৃন্দের সমতুল্য মর্মে শিয়াদের দাবির পক্ষে প্রদর্শিত 'হাদীসটি' সম্পর্কে ফায়সালা কী? এবারত নিম্নরূপ:

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.

[১০২] আহমদ: ফাদ্বায়িলুস সাহাবা, ১/৪৪১, হাদীস নং ৪০৩।

[১০৩] তাবারানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১২/২৪২, হাদীস নং ১২৯৯৮; আবু নুয়াইম : হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪.৯৫।

অর্থ: "আমার উম্মতের উলামা (হাক্কানী/রব্বানী) বনী ইসরাঈল বংশীয় আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-মণ্ডলীর মতো।"

এই হাদীস হতে শিয়াদের গৃহীত বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে যে, নুবূওয়্যতের সমস্ত গুণেই কি উলামা-এ-হাক্কানী/রাব্বানীমণ্ডলী আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)'বৃন্দের মতো? নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক! এ তো ওপরে উদ্ধৃত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক ও আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা উম্মত কখনো আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর খাসাইস তথা অনন্য সমস্ত গুণগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারেন না। অতএব, বর্ণনাটিতে কোনো কিছু উহ্য আছে আর তা হলো এলম (ঐশী জ্ঞান); এটা 'উলামা' শব্দটির ঘোষণা দ্বারা সাবেত বা প্রমাণিত হয়। অতএব, সাযুজ্য কেবল ঐশী/আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাজমান। এর দৃষ্টান্ত হলো পূর্ববর্তী পয়গাম্বর (আলাইহিমুস সালাম)'মণ্ডলীর মো'জেযার (অলৌকিক ক্রিয়ার) মতো এ উম্মতের আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহি আলাইহিম) বিশাল বিশাল কারামত প্রদর্শন করেছেন। আর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) দুআ' করেছিলেন যাতে তিনি উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সেই দোয়া ক্ববূল হয়েছে এবং তিনি উম্মত হিসেবে আসমান থেকে দুনিয়ায় আবার নেমে আসবেন। উম্মত হিসেবে ইমাম মাহদী (আলাইহিস্ সালাম)'এর অধীনে খেদমত করলেও পয়গাম্বর হিসেবে তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চেই থাকবে, যা পরিস্ফুট হয় এই বৃত্তান্তে যে তাঁর বেসালের পরে তাঁকে রওযায়ে আক্বদসে রাখা খালি জায়গায় সমাহিত করা হবে। অথচ সেখানে ইমাম মাহদী (আলাইহিস্ সালাম)'এর দাফন হবে না।

শেষ কথা: রাফেযী শিয়া গোষ্ঠী আমাদের দ্বীনের দলিলাদিকে বিকৃত করে এজেন্ডা বাস্তবায়নে অপতৎপর। অতএব, এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

হিজরী নববর্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে শরঈ দলিল

বিগত ২০২১ সালে এই বিষয়টি নিয়ে ফেইসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম, অথচ তাতে কেউ কেউ আমাদেরকে এ মর্মে দলিল প্রদর্শন করতে বলেছেন যে, ইতিপূর্বে কোন্ কোন্ বযূর্গ আলেম এ রকম করেছেন। সত্যি আফসোস! এরা ইসলামী ফিক্বাহ তথা বিধিবিধান শাস্ত্রের উসূল বা মূলনীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তাই নিচে এ নিয়ে আলোকপাত করলাম।

উসূল/মূলনীতিগত ক্বায়দা বা নিয়ম:

প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক সকল বস্তু (বা বিষয়ের) আসল বা মূল মোবাহ, অর্থাৎ, বৈধ। যথা - কাজী খাঁন, দুর্রে মুখতার ইত্যাদি ফেক্বাহ'র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে:

أن الأصل في الأشياء الإباحة.

অর্থ: সকল বস্তুর মূল বৈধ বা হালাল। আল্লাহর কিতাবে বা রাসূল (দ)'এর সুন্নাহতে নিষেধাজ্ঞা দ্বারাই কেবল এই বৈধতা রহিত হতে পারে। শায়খ ইউসুফ ক্বারাদাউয়ী সাহেব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এর সপক্ষে শরঈ দলিল উপস্থাপন করেছেন তাঁর অনলাইন সাইটে।[১০৪]

সার সংক্ষেপ হলো, ক্বুর'আন মজীদ, হাদীস শরীফ, ইজমায়ে উম্মত ও ক্বিয়াস দ্বারা যেসব বিষয় হারাম ঘোষিত হয়নি, সেগুলো বৈধ এবং উদ্দেশ্যভেদে সওয়াব ও পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত। সৎ উদ্দেশ্যে কৃত কর্মসমূহ সওয়াবের উৎস হবে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত কর্মসমূহ গুনাহের উৎস হবে। যথা - হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ ফরমান-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

[১০৪] লিঙ্ক: https://www.al-qaradawi.net/node/2241
এবং http://www.usislam.org/pdf/Lawful&Prohibited.pdf

নিশ্চয় কর্মসমূহ নিয়্যত তথা উদ্দেশ্য দ্বারা বিবেচিত।[১০৫]

এমতাবস্থায় যাঁরা কোনো বিষয়কে জায়েয বলেন, তাঁদের শরীয়তের দলিল প্রদর্শন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যাঁরা হারাম দাবি করেন, তাঁদেরই কেবল দলিল প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়। [এ ব্যাপারে শায়খ তাহিরুল কাদেরী সাহেবের 'মিলাদুন্নবী (দ:)' বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে]

শরঈ দলিল:

আল্লাহতা'লা এরশাদ ফরমান:

وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ.

অর্থ: তাদেরকে (মানুষদেরকে) আল্লাহর দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিন।[১০৬]

এ আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী হযরত মূসা (আ:)-এর প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন যেনো তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিনগুলো সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন। "আল্লাহর দিনগুলো" হলো সে সব দিন যা'তে বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল বা এমন সব দিন যেগুলোতে আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁরই বড় নেয়ামত তথা আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন।

'আল্লাহর দিনগুলোর' উপরোক্ত ব্যাখ্যার পক্ষে কুরআন মজীদ সাক্ষ্য দেয়, যেখানে হযরত মূসা (আ:)-কে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

অর্থ: "আর যখন মূসা (আ:) আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, স্মরণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি

[১০৫] ইমাম নববী কৃত হাদীসে আরবাঈন গ্রন্থ, ১ নং হাদীস।
[১০৬] সূরা ইবরাহীম, ৫ আয়াত।

দিতো এবং তোমাদের পুত্রদের যবেহ্ করতো ও তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো; এবং এতে তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ রয়েছে"।[১০৭]

আল্লাহ্ তা'লার উপরোল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম অনুযায়ী, হযরত মূসা (আ:)-এর জাতি যেদিন ফিরআউন হতে মুক্তি লাভ করেন সেদিনটি "আল্লাহর দিন" হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অতএব, 'আল্লাহর দিন'গুলো স্মরণীয় করে রাখতে এবং সেগুলোকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধভাবে পালন করতে এই উম্মতের সময়কালে যে হিজরী সাল চালু করা হয়েছে, যে সালের গণনা দ্বারা আমরা মীলাদুন্নবী (দ:) দিবস, রোযা, হজ্জ, দুই ঈদ, শবে ক্বদর, শবে মে'রাজ, শবে বর'আত, আশুরা, আহলে বায়ত-আসহাব (রা:) ও আউলিয়া কেরাম (রহ:)'এর বেসাল বার্ষিকী/উরস ইত্যাদি 'আল্লাহর প্রিয় দিবস' পালন করে থাকি, সেই নে'আমতপূর্ণ সালের শুরুতে মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অবশ্যই জায়েয ও সওয়াবদায়ক। বিশেষ করে মুসলমান তরুণ সমাজ নিজেদের এই ঐতিহ্যবাহী সাল গণনা যেখানে ভুলতে বসেছেন, সেখানে এটাকে বেশি বেশি স্মরণ করিয়ে দেয়া আরো বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিশেষে বলবো, ফেইসবুকে কারো কারো কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসুন আমরা সবাই হিজরী বর্ষকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করি এবং মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলি। আল্লাহ তৌফীক্ব/সামর্থ্য দিন, আমীন।

ফেইসবুকে অপপ্রচারকারীদের জবাবে -

পথভ্রষ্টদের চামচাগুলো একটাই ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাচ্ছে যে, কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিনে কারো বাবা মারা গেলে সেদিনটির প্রতিটি বার্ষিকীতে কি কেউ শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন? আরে বেয়াকুব, কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিন হলো আম তথা সাধারণ/সার্বিক। আর কারো আত্মীয় মারা যাওয়ার বিষয়টি হলো খাস তথা সুনির্দিষ্ট। কারো 'খাস' কোনো কারণে 'আম'

[১০৭] সুরা ইব্রাহীম, ৩ নং আয়াত।

বিষয় নাকচ হয়ে যায় না! যেমন (ঈদে) মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিবসে কারো বাবা মারা গেলে ওই দিনের উদযাপন নাকচ হয়ে যায় না। দ্বিতীয়তঃ ১লা মুহর্রম হিজরী বর্ষের আরম্ভ; আর ১০ই মুহর্রম আশুরা। আশুরার দিন কারবালার বিষাদময় ঘটনায় ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর শাহাদাত হয়েছিলো। কিন্তু সেটা তো ১০ দিন পরে! এর সাথে ১লা তারিখের সম্বন্ধ কোথায়? জালিয়াতিরও তো একটা সীমা থাকা উচিৎ! উপরন্তু, আমি ইতিপূর্বের পোস্টে বলেছি যে আমরা সুন্নী মুসলমান সমাজ হিজরী নববর্ষে উল্লাস করি না, বরং স্রেফ মুসলমানদের প্রতি শুভ কামনা ব্যক্ত করি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ও জোরজবরদস্তি এটাকে উল্লাস প্রকাশের দিন হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস একমাত্র এজেন্ডাধারী মোনাফেক্ব রাফেযীচক্রই পেতে পারে! অতএব, এদের প্রতারণার ফাঁদে কেউ পা দেবেন না।

রাফেযী-শিয়া চেনার সহজ উপায়

ভূমিকা

বর্তমান ডিজিটাল যুগে অনলাইনে অনেক ফিতনা ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এমনি একটি ফিতনা রাফেযী-শিয়াচক্রের। ইরানী পেট্রো-ডলার দ্বারা মদদপুষ্ট হয়ে রাফেযী গোষ্ঠী আমাদের দেশের সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত তরুণদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং বিভ্রান্ত করছে। আমরা সবাই জানি, আমাদের ইসলাম ধর্ম আহলে বাইত-এ-রাসূল ও সাহাবা-এ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বস্তুতঃ তাঁরা দ্বীন প্রচার-প্রসারের মিশনে ছিলেন আত্মোৎসর্গিত। অতএব, তাঁদের সবার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা মুসলমান সমাজ অন্তরে লালন করে আসছেন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই। কিন্তু প্রাথমিক যুগে গোড়াপত্তন হওয়া ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিলো, যার পেছনে ছিলো ধর্মের প্রকাশ্য ও অন্তর্ঘাতী শত্রুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ও হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যকার ইজতিহাদী তথা ধর্মীয় গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তজনিত মতপার্থক্য এ রকমই একটি ঘটনা ছিলো। আমরা তাঁদের ইজতিহাদী মতপার্থক্য নিয়ে এখানে আলোচনা করবো না, বরঞ্চ কেবল তাঁদের সম্পর্কে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরে শিরোনামের মূল প্রতিপাদ্যে মনোনিবিষ্ট হবো, ইন-শা-আল্লাহ।

ইমামে আলী (ক.) সম্পর্কে আমাদের আকীদাহ

আমরা জানি, আহলে বাইত ও আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন এই উম্মতের সেরা প্রজন্ম। এই সেরা প্রজন্মের মাঝে খলীফাতুল মুসলিমীন সর্ব-হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন সেরাদের সেরা। সেরা আরো কয়েকজন আছেন, যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ; যেমন আহলে বাইতের জ্যেষ্ঠ সদস্য হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই শ্রদ্ধেয় চাচাজান আধ্যাত্মিক জগতের একজন পথিকৃৎ। খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত

আমলে খরা দেখা দিলে তিনি বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনার (এস্তেসক্বা) সময় হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে অসীলা/মধ্যস্থতাকারী হতে অনুরোধ করেন এবং তিনি খলীফার আরজি গ্রহণ করেন, আর আল্লাহতায়ালাও তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি মঞ্জুর করেন (বুখারী শরীফ)। রাফেযী শিয়াচক্র অপপ্রচার করে থাকে যে সর্ব-হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান প্রমুখ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ষড়যন্ত্রের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-কে খেলাফত হতে বঞ্চিত করেন। অথচ হযরত অব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় আহলে বাইত-সদস্য খলীফা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আর্জি কবূল করে তাঁর খেলাফতকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এই সেই হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যাঁর সম্মানার্থে তাঁর হস্তপদ মোবারক চুম্বন করতেন হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু।[১০৮] ওপরের ঘটনায় বোঝা যায় আধ্যাত্মিক প্রশাসনে হযরত আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে, যেখানে হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো কাশফ-মুকাশাফা ও কারামতসম্পন্ন মহান ওলীও তাঁরই অসীলা নিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি কিন্তু রাফেযী শিয়াচক্র কৌশলে এড়িয়ে যায়। কেননা এতে তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে!

ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) সম্পর্কে আমাদের সুন্নীদের আকীদা-বিশ্বাস দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তিনি আমাদের মহান খলীফা ও ইমাম। হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে তাঁর ইজতিহাদী মতপার্থক্যের ঘটনায় তিনিই সঠিক ছিলেন বলে আমাদের সুন্নী ইমামমণ্ডলী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইজতিহাদী গবেষণায় ভুল করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন হাদীসে, ঠিক যেমনি প্রশংসা করেছেন অন্যান্য মহান সাহাবা (রা.)-বৃন্দের বেলায়ও। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের সুন্নী ইমাম-মুহাদ্দেসীনবৃন্দের সমর্থিত এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলোই কেবল গ্রহণযোগ্য। রাফেযী শিয়াচক্র এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস বর্ণনা করে থাকে যার কোনো সহীহ ভিত্তি নেই। তারা ইদানীং ফেইসবুকে কোনো কোনো ইমামের নামে বক্স বানিয়ে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর শানে বানোয়াট 'হাদীস' পরিবেশন করছে। আমরা সুন্নী তরুণদের বলবো, মুহাদ্দেসীন ইমামবৃন্দের এ ধরনের বর্ণনার ব্যাপারে সমর্থনসূচক ঐকমত্য ছাড়া এগুলো

[১০৮] ইমাম বুখারী কৃত আদাবুল মুফরাদ দ্রষ্টব্য।

গ্রহণ করবেন না। কেননা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) সম্পর্কে এই ধরনের বানোয়াট বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন অনেক হাদীসে।[১০৯]

হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ব্যাপারে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ হাম্বল (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং এর পাশাপাশি আল-বাযযার, আবূ এয়ালা ও আল-হাকিম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَبْغَضَتْهُ يَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ، مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي.

অর্থ: হযরত আলী (ক.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, 'তোমার সাথে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এক সাদৃশ্য আছে; ইহুদীরা তাঁকে এতো ঘৃণা করেছিলো যে তারা তাঁর মাকে অপবাদ দিয়েছিলো; আর খৃষ্টানরা এতো ভালোবেসেছে যে তারা তাঁকে এমন মর্যাদার আসনে আসীন করেছে যা তাঁর নয়'।[১১০]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন: "আমার ব্যাপারে (আকীদাগত কারণে) দুই ধরনের লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে: আমার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায়; দ্বিতীয়ত যারা অতি ভক্তিসহ আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা (মানে পূজো) করে।"[১১১]

[১০৯] দেখুন 'রাফেযী চক্রের ধোঁকা ভঞ্জন' প্রবন্ধটি।

[১১০] রেফারেন্স: আবু মরইয়াম এবং আবু আল-বখতারী কিংবা আবদুল্লাহ ইবনে সালামা, এই দু'জনের কোনো একজন থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নিজ 'আল-সুন্নাহ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৪ #১২৬৬-১২৬৮), আল-হারিস ইবনে আব্দিল্লাহ হতে ইবনে আব্দিল বারর তাঁর 'আল-এস্তিয়াব' কেতাবে (৩:৩৭), আল-নুওয়াইরী স্বরচিত 'নিহায়াত আল-আরব' পুস্তকে (২০:৫) এবং আবু আল-হাদিদ কৃত 'শরহে নাজহ আল-বালাগা' (১:৩৭২)।

[১১১] রেফারেন্স: এটা বর্ণনা করেছেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে আবু এয়ালা তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে (১:৪০৬ #৫৩৪) এবং ইমাম আহমদও দুইটি দুর্বল সনদে নিজ 'মুসনাদ' কেতাবে‌ যাকে চিরাচরিত উদারতায় 'হাসান' বলেছেন শায়খ আহমদ শাকির (২:১৬৭-১৬৮ #১৩৭৭-১৩৭৮); আল-হাকিম (৩:১২৩)-ও এর সনদকে সহীহ বলেছেন, তবে আয্ যাহাবী এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন এতে আল-হাকাম ইবনে আব্দিল মালিক থাকার কারণে; একই মত পোষণ করেন ইবনুল জাওযী নিজ 'আল-এলাল আল-মুতানাহিয়া' পুস্তকে (১:২২৭ #৩৫৭)। আল-হায়তামী স্বরচিত 'মজমাউয্ যাওয়াইদ' গ্রন্থে' (৯:১৩৩) একই কারণে ওপরের সকল এসনাদের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন, তবে তিনি উল্লেখ করেন যে আল-বাযযার এটা বর্ণনা করেছেন তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে'। অনুরূপ দুর্বল সনদে এটা বর্ণনা করেন আল-বায়হাকী নিজ 'আল-সুনান আল-কুবরা' পুস্তকে (৫:১৩৭ #৮৪৮৮) এবং ইমাম আহমদ তাঁর 'ফযাইলে সাহাবা' কেতাবে (২:৬৩৯ #১০৮৭, ২:৭১৩ #১২২১, ২:৭১৩ #১২২২)।

এ-ই হলো খারেজী ও রাফেযী-শিয়াদের সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ফায়সালা! অনুরূপ আরো অনেকগুলো হাদীসের সংকলন ইতিপূর্বে বিধৃত হয়েছে।

ওপরের হাদীসে লক্ষণীয় যে, পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতি ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা তথা পূজোর সাথে রাফেযী-শিয়াচক্রের অনুরূপ বন্দনা তথা অর্চনার তুলনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত দলটি পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-কে পূজো করে বলে আমরা যেমন উক্ত পয়গাম্বর (আ.)-কে ঘৃণা করি না, ঠিক তেমনি রাফেযী-শিয়াচক্রের দ্বারা ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর অর্চনার কারণেও তাঁকে ঘৃণা করি না।[১১২] কেননা বুযূর্গবৃন্দের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ একেবারেই ধর্মবিরোধী কাজ! আমাদের ধর্ম হচ্ছে আদবশীলতার। বড় বড় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান যথাযথভাবে যেমনটি দেই, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদের চেয়ে কম সম্মানের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরও তাঁদের মোকাবিলায় হেয় করি না। এ রকম বেয়াদবি করলে শেষোক্তদের অন্তরে ব্যথা লাগবে এবং পরলোকে আমাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে! আল্লাহর কাছে গ্রেপ্তার হবার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই! আমাদের তরীক্বতের ইমাম হযরত মওলানা শাহ সূফী আবূল মোকারেম মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব কেবলা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) একবার বলেন, "এক তরীক্বা আরেক তরীক্বাকে ইনকার করতে পারে না; এতে ফয়েয-ই চলে যাবে।" মানে এক ওলী অপর ওলীকে ছোট হলেও অবজ্ঞা করতে পারেন না, করলে রূহানী শ্রেষ্ঠত্ব তিরোহিত হবে। একইভাবে বুযূর্গ সাহাবা (রা.)-দের আমরা শ্রদ্ধা করবো, আবার তাঁদের চেয়ে কম মর্যাদাবান সাহাবা (রা.)-দেরও অশ্রদ্ধা করবো না, পাছে তাঁদের অন্তরে আঘাত লাগে এবং আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়!

[১১২] নোট: আমরা স্রেফ পথভ্রষ্টদের কুকর্মের বিরোধিতা করি।

আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রসঙ্গ

রাফেযী-শিয়া গোষ্ঠী হযরতে আসহাবে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের লক্ষবস্তু করে, তিনি আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। অন্যান্য সাহাবা (রা.)-কেও তারা আঘাত করতে সচেষ্ট, তবে এতোখানি আক্রোশ সহকারে নয়। এদেশটি সুন্নী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার দরুন তারা অবশ্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা মুখে বলে, "মু'য়াবিয়া সাহাবী," তবে একই নিঃশ্বাসে আরো বলে, "তিনি বাগী/বিদ্রোহী ও মোনাফেক্ব" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর ভেড়ার চামড়ার আড়ালে তাদের হিংস্র নেকড়ে বাঘের থাবা সচেতন মানুষের সামনে দৃশ্যমান হয়ে যায়! আমাদের কী করণীয়?[১১৩]

শিয়া চেনার সহজ পদ্ধতি

সুন্নী মুসলমান সর্বসাধারণের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটাই। কীভাবে শিয়া চিনবেন? কেননা তারা তাকিয়্যা তথা আকীদা গোপন করে থাকে। বিষয়টি জলবৎ তরলং। আমাদের শুধু একটু গবেষণা করতে হবে। দুনিয়ার সমৃদ্ধির জন্যে আমরা গবেষণা করি, অথচ আখেরাতের সমৃদ্ধির জন্যে তা করবো না, এ কেমন কথা? মনে রাখবেন, রাফেযী-শিয়া গোষ্ঠী আমাদের শরঈ দলিলগুলোর ওপরে যথেষ্ট গবেষণা করে, যদিও তা শয়তানী গবেষণা! তারা আহলে বাইত (রা.)-এর প্রতি লোক-দেখানো ও মেকি প্রেম জাহির করে কোথায় কীভাবে আহলে বাইত (রা.) ও আসহাব (রা.)-বৃন্দের মাঝে বিন্দুমাত্র মতপার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় (মানে অতিরঞ্জিত) করে দেখানো যায়, সেই ধান্ধায় সর্বদা থাকে ব্যস্ত [এসব মতপার্থক্য সম্পর্কে আমাদের ইমামমণ্ডলী সুষ্ঠু সমাধান দেওয়া সত্ত্বেও]। অতএব, রাফেযী-শিয়া গোষ্ঠীর দ্বারা সাহাবা (রা.)-মণ্ডলীর প্রতি বেয়াদবি বা অসৌজন্যমূলক কোনো আচরণ দেখলেই আপনারা সতর্ক হয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, ভেড়ার চামড়ার আড়ালে নেকড়ে বাঘের থাবা দেখতে না পাওয়াই মেষপালের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে!

[১১৩] বি.দ্র. আমাদের বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হচ্ছে - এডমিন।

খলীফা উসমান (রা.)'এর শাহাদাত ১৮ যিলহজ্জ, ১২ তারিখ নয়

লেখক: দ্বীনীভাই ও ফেইসবুক বন্ধু মাওলানা মাহমূদ হাসান

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হাযরাত উসমান (রা.)'এর শাহাদাত প্রসঙ্গে এই আলোচনার অবতারণা। রোজা অবস্থায় তিনি শহীদ হন, আর জান্নাতে রোজা ভাঙেন। ১২ই জিলহজ্জ নয়, ১৮ই জিলহজ্জে শহীদ হন। অতএব, হাযরাত উসমান (রা.)'এর শাহাদাত দিবসে রাফেযী শিয়াদের বড় ঈদ - 'ঈদে গাদীর' পালন করা থেকে মুসলমান সর্বসাধারণ সাবধান!

ইমাম নাফি' (রহ.) বর্ণনা করেছেন: খলীফা উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন যে রাতে, তিনি পরের দিন সকালে শহীদ হন। নবীজী ﷺ বললেন, হে উসমান, আজ রাতে আমাদের সাথে ইফতার কোরো। অতঃপর তিনি রোজা অবস্থায় শহীদ হন।

রেফারেন্স:

১. দালায়িল আল্ নাবূয়্যাহ লিল বাইহাকি, ৭/৪৮।
২. হাদীসটির মান সহীহ, ইবনু হাজর আল-আসকালানী (রহ.) এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

আরবী পাঠ

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُتِلَ فِي صَبِيحَتِهَا فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَفْطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ فَقُتِلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

دلائل النبوة للبيهقي ٧/٤٨

المحدث ابن حجر العسقلاني خلاصة حكم المحدث رجاله ثقات في المطالب العالية 5/21

অপর এক বর্ণনায় সর্ব-ইমাম ইবনে আদি (রহ.) ও ইবনে আসাকির (রহ.) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

يا عثمان ! إنك ستؤتى الخلافة من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها وصم في ذلك اليوم تفطر عندي.

মহানবী (সা) বলেন, 'ওহে উসমান! আমার (বেসালের) পরে তোমার কাছে খেলাফতের ভার ন্যস্ত করা হবে, কিন্তু মোনাফেকরা চাইবে যেন তুমি তা ত্যাগ করো। তুমি ত্যাগ কোরো না, বরং রোযা রেখো যাতে তুমি আমার সাথে (ওই রোযা) ভাঙ্গতে পারো'।"

রেফারেন্স

১. ইবনে আসাকির, 'তারিখে দামেশক' (৩৯:২৯০),

২. ইবনে আদি তাঁর 'আল-কামিল' (৩:২৭);

৩. আয্ যাহাবী, 'মিযান' গ্রন্থে' (২:৪২৪) যা'তে দুর্বল সনদ আবু আল-রাহহাল খালেদ ইবনে মোহাম্মদ আল-আনসারী, তিনি এর একমাত্র বর্ণনাকারীও।

নিচের আলোচনা পাঠককে খুব সহজে বুঝতে সাহায্য করবে যে হাযরাত উসমান (রা.)'এর শাহাদাত দিবস ১২ই জিলহজ্জ নয়। হাযরাত উসমান (রা.)-সহ সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)'এর ঘোর বিরোধী হচ্ছে রাফেযী শিয়া গোষ্ঠী। খলীফা হাযরাত উসমান (রা.)'এর শাহাদাত দিবসে শিয়াচক্র তাঁর শহীদ হওয়াকে কেন্দ্র করে ওই দিনটি ঈদে গাদীর নামে মহা ঈদের জাঁকজমক সহকারে পালন করে থাকে।

হাযরাত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত ১২ই জিলহজ্জ না হওয়ার কারণ

ঈদুল আযহার পরের তিন দিন তথা জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে 'আইয়ামে তাশরীক' বলা হয়।

হাদীসে এ দিনগুলোকে 'পানাহার ও আল্লাহর যিকির'-এর দিন বলা হয়েছে। এ তিন দিন ফরয বা নফল রোযা রাখা নিষেধ।

আম্মাজান হাযরাত 'আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন,

«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»

"যে (হাজী)'র নিকট الهَدْيَ/ কুরবানীর পশু নেই তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সাওম/রোজা পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।"

রেফারেন্স: সহিহ বুখারী হা/১৯৯৭।

নুবাইশা আল-হুযালী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.

"আইয়্যামে তাশরীক পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন"।

রেফারেন্স: সহীহুল জামে, হাদীস/২৬৮৯-নুবাইশা আল হুযালী (রা.) থেকে বণিত।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

"তোমরা এই দিনগুলোতে রোযা রেখো না। কেননা, এগুলো পানাহারের দিন।"

রেফারেন্সঃ সহীহুল জামে, হাদীস/৭৩৫৫-হামযা বিন আমর আল আসলামীন (রহ.) থেকে বর্ণিত।

সুতরাং এ দিনগুলোতে কাযা, কাফফারা, মানত বা অন্য কোনো ধরনের নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। (কেবল হাজীদের বিশেষ ক্ষেত্রে রোজা রাখার বিষয়টি ভিন্ন)

উল্লেখ্য যে, আরবী মাসের **১৩, ১৪ ও ১৫** তারিখ আইয়ামে বীজ বলা হয়। প্রতি মাসে এই তিনটি রোজা রাখলে সারা মাস রোজা থাকার সওয়াব পাওয়া যায়।

কিন্তু জিলহজ মাসের **১৩** তারিখ যেহেতু আইয়ামে তাশরীক-এর অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ওই দিন রোজা রাখা জায়েজ নেই।

কাজেই প্রমাণিত হলো যে খলীফা হাযরাত উসমান (রা.) **১২**ই জিলহজ্জে নয়, বরং **১৮**ই জিলহজ্জে শাহাদাৎ লাভ করেন।

ঈমাম নাসাঈ (রহিঃ)-এর নামে হাযরাত মুআবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে শিয়াদের মিথ্যাচারের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট

লেখক: দ্বীনীভাই ও ফেইসবুক বন্ধু মাওলানা মাহমুদ হাসান

ঈমাম নাসাঈ (রহিঃ)' এর অভিমত হাযরাত মুআবিয়া (রাঃ)' এর সম্পর্কে।

হাযরাত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিদ্বেষীরা দাবি করেন নাসায়ী (রহিঃ) ও বুখারি (রহিঃ) বলেন, মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে কোনো হাদিস নেই। তারা ইমাম বুখারীর একটি অধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন।

باب ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ رضى الله عنه.

এ অধ্যায়ের অধীনে ইবনে হাজার বলেন,

وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق ابن راهويه والنسائي وغيرهما، والله أعلم.

হাযরাত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফযীলতে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে যা ইসনাদের দিক দিয়ে সহীহ নয়। আর এই মতের উপর রয়েছেন ইসহাক বিন রুহাওয়াই এবং নাসায়ী প্রমুখ। [ফাতহুল বারী] তাই মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিদ্বেষীরা বলেছে, দেখুন মুয়াবিয়া (রা.)-এর কোনো মানাকিব নেই।

প্রতিক্রিয়াঃ ১. আন-নাসায়ী'এর সমালোচনা

ঈমাম নাসায়ী (রহিঃ)'এর প্রসঙ্গ। তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ক) সিয়ার আলাম আন-নুবালা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল হাকিম আদ-দারাকুতনি থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ঈমাম নাসায়ী (রহিঃ)'কে মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি নীরব ছিলেন, লোকেরা তাঁকে জামে মসজিদে মারতে শুরু করে, তখন তিনি

বলেছিলেন আমাকে মক্কায় নিয়ে যান, তারা তাঁকে মক্কায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তিনি মারা যান।[১১৪]

শাহ্ জুবায়ের আলী জাই বলেছেন: যদি এই বর্ণনাটি আল-হাকিম বা আদ-দারাকুতনী থেকে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি বলব: আদ-দারাকুতনী ৩০৫ বা ৩০৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আন-নাসায়ী ৩০৩ হিজরিতে মারা যান, তাই এই বর্ণনাটি মুনকাতা ও মারদুদ।[১১৫]

সুতরাং, এটি আদ-দারাকুতনী থেকে প্রমাণিত নয়, এবং যদি প্রমাণিত হয় তবে তা মুনকাতা।

খ) এটি আল হাকিম "মুআরিফাত উলূম আল হাদীছ" নং ১৮২-এ উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মদ বিন ইসহাক (বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন মান্দাহ) আস-বাহনী থেকে যিনি বলেছেন যে আমার শিক্ষকরা বলেছেন (এই গল্প)। শায়খ জুবায়ের আলী জাই জবাব দিয়েছেন: এই সমস্ত শিক্ষক অজানা ছিলেন, তাই এই বর্ণনাটি দুর্বল।[১১৬]

আদ-দাহাবী ইবনে মান্দাহ থেকে হামযাহ আল আকবি আল মিসরি থেকে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।[১১৭]

শায়খ জুবায়ের আলী জাই বলেন, এটা সনদ ছাড়া।[১১৮]

গ) ইবনে আদিম একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যেখানে ইমাম নাসায়ী (রহিঃ) মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশংসায় দুর্বল হাদিস লিখেছেন এবং আবু মনসুর বলেছেন, আপনি একজন খারাপ শিক্ষক, আপনার আমার প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার নেই।)[১১৯]

হাফিদ সাখাউই এর জবাবে বলেছেন:

---

[১১৪] সিয়ার, ১৪/১৩৩।
[১১৫] তাহকিকি ইসলাহি আউর ইলমি মাকালাত, পৃষ্ঠা ২৭৩।
[১১৬] তাহকিকি ইসলাহি আউর ইলমি মাকালাত, পৃষ্ঠা ২৭৩।
[১১৭] সিয়ার, ১৪/১৩২।
[১১৮] তাহকিকি ইসলাহি আউর ইলমি মাকালাত, পৃষ্ঠা ২৭৩।
[১১৯] بغية الطلب فی تاریخ حلب ۸۵۲/۲।

لا يصح

এটা খাঁটি নয়।

بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني ص-(١٣٠)

কারণ বর্ণনাকারীদের

"أبو اسحاق " এবং "أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الصيرفي"

"ابراهيم بن نصر البزاز"

বিশ্বস্ততা পাওয়া যায় না।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সম্পর্কে আন-নাসায়ীর প্রশংসা

(ক) ইমাম আন-নাসাই থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যেমন ইমাম আদ-দাহাবী উদ্ধৃত করেছেন:

নাসায়ী তার ছাত্রকে বললেনঃ আমি যখন দামেস্কে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম অনেকেই আলী (রাঃ)'এর বিরুদ্ধে, তাই আমি লিখলাম "আলি (রাঃ)-এর খাসাইস।" আমি আশা করেছিলাম যে এই বইটির মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন, তারপর তিনি লিখেছেন "ফাদাইল আস-সাহাবা" এর উপর একটি বই (যা'তে মুয়াবিয়া রা. অন্তর্ভুক্ত), তারপর আন-নাসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কেন মুয়াবিয়া (রা.)-এর গুণাবলী নিয়ে লিখছেন না (বিশেষত, তিনি ইতিমধ্যেই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর প্রশংসায় সকলের মর্যাদা সম্বলিত সাধারণ (আমভাবে) হাদীস লিখেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, মুয়াবিয়া রা. সহ), যার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। আমি তাঁর জন্য কী লিখব? আমি কি সেই হাদিস লিখব যা'তে বলা হয়েছে: আল্লাহ যেন তাঁর (মুয়াবিয়ার) পেট ভরে না দেন"?[১২০]

---

[১২০] তাদকিরাতুল হুফ্ফাজ ২/১৯৪, শাহ যুবায়ের আলী জাই এটিকে দুর্বল বলেছেন, বিস্তারিত প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁর তাহক্বীকি ইসলাহি অর ইলমি মাকালাত", খণ্ড ৬, ২৭২-২৭৫ বইটি দেখুন।

আয-যাহাবী উদ্ধৃত করার পরেই বলেছেন:

قلت: لعل هذه منقبة معاوية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة.

আমি বলি: এটি মুয়াবিয়ার (রা.) জন্য প্রশংসা, কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হে আল্লাহ, যাকে আমি অভিশাপ দিই বা যাকে আমি তিরস্কার করি, তাকে পবিত্রতা ও রহমতের উৎস করুন।[১২১]

যদিও এই বর্ণনাটিও প্রমাণিত নয়, কিন্তু তারা যখন অন্য বর্ণনাগুলোকে উদ্ধৃত করে, তখন তারা কেন আদ-দাহাবীর বর্ণনার সাথে এটিকে উদ্ধৃত করে না? এই বর্ণনায় নাসায়ী সাধারণত মুয়াবিয়া (রা.) সহ সাহাবার প্রশংসা করেছেন এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দিষ্ট হাদিস সম্পর্কে তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশংসায় এমন একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যেটি আদ-দাহাবী বলেছেন,

(খ) যদি তারা মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্বল বর্ণনাগুলো মেনে নেয়, তাহলে নিচের কথাগুলো কী হবে? আল মিজি বলেছেন:

قَالَ الْحَافِظ أبو القاسم : وهذه الحكاية لاتدل على سوء اعتقاد أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ فِي معاوية بْن أَبِي سفيان، وإنما تدل على الكف فِي ذكره بكل حال

ثم روى بإسناده عَن أَبِي الْحَسَن علي بْن مُحَمَّد القابسي، قال: سمعت أَبَا علي الْحَسَن بْن أَبِي هلال يَقُول: سئل أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النَّسَائِي عَنْ معاوية بْن أَبِي سفيان صاحب رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة.

[১২১] তাদকিরাতুল হুফফাজ, ২/১৯৫।

হাফিদ আবুল কাসিম (ইবনে আসাকির) বলেছেন: এই বর্ণনাটি (আন-নাসায়ী (রহিঃ)-কে যখন মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি নীরব ছিলেন মর্মে বর্ণনা) এটির প্রমাণ নয় যে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) সম্পর্কে নাসাঈর ভুল আকীদা ছিল, বরং এটা প্রমাণ করে যে, নাসায়ী অনুসারে, যখন মুয়াবিয়া (রা.)-এর কথা বলা হয়, তখন (আমাদের) চুপ থাকা উচিত।

তারপর তিনি (ইবনে আসাকির) আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল কাবিসি থেকে তাঁর সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু আলী হাসান ইবনে আবি হিলালকে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আবু আবদুল রহমান আন-নাসাইকে মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

"ইসলাম হল দরজা সহ একটি ঘরের মত। ইসলামের দরজা সাহাবা। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের কুৎসা রটনা করে সে ইসলামের ক্ষতি করতে চায়, যেভাবে ঘরে প্রবেশের জন্য দরজা ধাক্কা দেয়। মুয়াবিয়া (রাঃ)'এর ব্যাপারে, যে তাঁর সম্পর্কে খারাপ কথা বলে সে সাহাবাকে খারাপ বলার উপায় খুঁজে বের করে।"[১২২]

(গ) নাসায়ী নিজেই মুয়াবিয়া (রা) থেকে নবী কারীম ﷺ -এর অনেক সুন্নাহ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন আল-মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত যে, মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেছেন: "আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা ধারণা দিতে নিষেধ করেছেন।[১২৩]

বর্ণিত হয়েছে যে, মুজাম্মি বিন ইয়াহইয়া আল-আনসারী বলেছেন: "আমি আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফের সাথে বসে ছিলাম যখন মুয়াযযিন আযান দিল। তিনি বললেন: 'আল্লাহু আকবার; আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)' এবং তিনি (এছাড়া) দুবার তাকবীর উচ্চারণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ

[১২২] তারীখ দামিশক ৭১-১৭৪, তাহদীব আল-কামাল, খণ্ড ১ পৃ. ৩৩৯-৩৪০, তাহদিব আল কামালে বর্ণনাকারীদের সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এটি সম্পূর্ণ চেইন নয়, আল্লাহু আ'লাম।
[১২৩] সুনানে নাসায়ী, ৫০৯৫।

নেই)' এবং তিনি দুবার সাক্ষ্যও পাঠালেন। তারপর তিনি বললেন: 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল),' এবং তিনি (এছাড়া) দুবার সাক্ষ্য পাঠালেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ 'আমাকে এটাই মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য থেকে বর্ণনা করেছেন। মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন: "একজন লোক এসে কিছু চাইতে পারে, এবং আমি প্রত্যাখ্যান করি যতক্ষণ না আপনি সুপারিশ করেন, যাতে আপনি পুরস্কৃত হন।" এবং রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন: "শাফাআত কর এবং তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে।"[১২৪]

তাই শায়খ ত্বহা কারান বলেছেন: মুয়াবিয়াকে সিহাহ সিত্তাহতে প্রায় ৫০টি হাদীস (প্রায় ১০টি পুনরাবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত) বর্ণনা করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্তত ২৯টি হাদীস ইমাম আন-নাসায়ী তাঁর রচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সিহাহ সিত্তাহর বাকি লেখকদের বাদ দিয়ে এর মধ্যে অন্তত ১৩টি শুধুমাত্র ইমাম আন-নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।[১২৫]

ইমাম আন-নাসায়ী (রহিঃ) যদি হাযরাত মুয়াবিয়া (রাঃ) বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন তবে তিনি হাযরাত মুয়াবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যেকোন হাদীসের অন্তর্ভুক্তি এড়িয়ে যেতেন যেভাবেই হোক। এই বর্ণনাগুলোর বিপরীতে দেখা যাক তাঁর (নাসাঈর) নিজের ছাত্র তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কী বলেছেন।

এই বর্ণনাগুলোর বিপরীতে দেখা যাক তাঁর (নাসাঈর) নিজের ছাত্র তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কী বলেছেন।

(ঘ) ইমাম আন-নাসায়ী-এর ছাত্র, ইবনে ইউনাস আল মিসরী বলেন:

وكان خروجه من مصر فى ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة، وتوفى بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة.

[১২৪] সুনানে নাসায়ী, ২৫৫৮।

[১২৫] দেখুন আল-মিজি: তুহফাত আল-আশরাফ, খণ্ড ৮ পৃ. ৪৩৪-৪৫৫।

তিনি ৩০২ হিজরিতে জিলকদে মিশর থেকে যান এবং ১৩ সফর সোমবার ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন।[১২৬]

হাফিদ আদ-দাহাবীও উপরে সিয়ার ১৪/১৩৩ গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন:

قُلْتُ: هَذَا أَصَحُّ. فَإِنَّ ابْنَ يُونُسَ حَافِظٌ يَقِظٌ وَقَدْ أَخَذَ عَنِ النَّسَائِيِّ، وَهُوَ بِهِ عَارِفٌ.

আমি বলি এটা অধিকতর সহীহ, ইবনে ইউনাস হাফিদ এবং আন-নাসাইয়ের ছাত্র এবং তিনি আরিফ ছিলেন। (উদ্ধৃতি শেষ)

শায়খ জুবায়ের আলী জাই বলেছেন: ঘটনাটি যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে নাসাইয়ের নিজের ছাত্র তাঁর মৃত্যুর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করেননি কেন?[১২৭]

ডাঃ বাশার আল আওয়াদ বলেছেন:

ورجع الذهبي قول الطحاوي وابن يونس وصححه كما في تاريخ الاسلام (الورقة: ١٣ أحمد الثالث ٢٩١٧/ ٩) وتابعه في ذلك تلميذه الصلاح الصفدي في الوافي (٦ / ٤١٧)

আদ-দাহাবী আত-তাহাবী এবং ইবনে ইউনাস (তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে আন-নাসাইয়ের ছাত্র)-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন এবং "তারীখ আল ইসলাম" ৯/২৯১৭ এ উল্লেখিত হিসাবে এটি প্রমাণিত হয়েছে এবং তাঁর ছাত্র সালাহ আস-সাফাদী তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।[১২৮]

তাহদীব আল কামালের তাহকীক ১৩২৮:

সংক্ষেপে–

[১২৬] তারীখ ইবনে ইউনাস ২/২৪ নং ৫৫।

[১২৭] তাহকীকী ইসলাহি অর ইলমি মাকালাত" খণ্ড ৬ ২৭৫।

[১২৮] "আল ওয়াফি" ৬/৪১৭।

- দুর্বল বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি লোকদের দ্বারা মার খেয়ে মক্কায় মারা গেছেন। আর তাঁর নিজের ছাত্র বলেন তিনি ফিলিস্তিনে মারা গেছেন।

- আন-নাসাইয়ের ছাত্র, আত-তাহাবী, আদ-দাহাবী, সালাহ আস-সাফাদি এবং শাহ জুবায়ের আলী জাই এই কথাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেহেতু এটা তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত হয়নি। যেখানে বলা হয়েছে যে আন-নাসাইকে প্রহার করা হয়েছিল, কারণ তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর কোনো ফাদায়েলের কথা উল্লেখ করেননি এবং মক্কায় মারা গেছেন।

নাসায়ী মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং দুটি দুর্বল বর্ণনায় তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশংসাও করেছেন।

২. বুখারী দ্বারা প্রণীত অধ্যায় "জিকির আল মুয়াবিয়া (রা.)"

ইমাম বুখারী (রহিঃ) কিতাব বা বই শিরোনামে এই অধ্যায়টি এনেছেন :

كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের ফাদাইল সম্বলিত কিতাব" যার অর্থ ইমাম বুখারী মুয়াবিয়া (রা.) সহ সাহাবাদের ফাদাইল উদ্ধৃত করেছেন। যদি তর্কের খাতিরে আমরা দাবীর সাথে একমত হই, তাহলে ইমাম বুখারী অনেকগুলো অধ্যায় করেছেন যেমন:

بَابُ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

বাবু জিকির আল আব্বাস ইবনি আব্দিল মুত্তালিব।

তিনি ছিলেন রাসূলে কারীম ﷺ -এর চাচা।

ذِكْرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

জিকরু ত্বলহাতাবনি উবাইদিল্লাহ

তিনি আশরা মুবাশারার মধ্যে রয়েছেন।

ذِكْرُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

জিকরু ওসামা ইবনে যায়েদ

ذكر مُصعب بن عُمَيْر

মুসআব ইবনে উমাইর রাঃ

তিনি এ অধ্যায়ে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।

باب ذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه

بَابُ ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ

بَابُ ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ

এখন কেউ কি বলতে পারে যে আব্বাস ইবনে আবদুল মুতলিব (রাঃ), ইবনে আব্বাস রাঃ, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ), ওসামা ইবনে যায়েদ এবং মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) এবং অন্যান্যদের কোন ফজিলত নেই? না।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এটাই প্রমাণ যে, তিনি কিছু অধ্যায় "যিকর" সহ উল্লেখ করেছেন, কিছু "মানাকিব" ইত্যাদি সহ। কিন্তু সব কটিই "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের ফাদাইল সম্বলিত গ্রন্থে রয়েছে।" যা ইমাম বুখারীর মতে এই সাহাবায়ে কেরামের মানকিবাত ও ফাদায়েল প্রমাণিত হওয়ার প্রমাণ। যেমনটি আল্লামা আয়নী হানাফী তাঁর বুখারীর তাফসীরে ব্যাখ্যা করেন:

إنما لم يقل مناقب ابن عباس مثل غيره لأنه قد عقد له بابا في كتاب العلم حيث قال باب قول النبي أللهم علمه الكتاب ثم ذكر عنه أنه قال ضمني رسول الله وقال أللهم علمه الكتاب وهذا منقبة عظيمة وا كتفى به عن ذكر لفظ مناقب هنا.

এবং তিনি (বুখারী) ইবনে আব্বাসের ফযীলত বলেননি যেভাবে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের জন্য বলেছিলেন, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই জ্ঞানের কিতাব শিরোনামে একটি অধ্যায় তৈরি করেছেন যে "হে আল্লাহ নবীর

কথার অধ্যায় তাকে কিতাব শিখিয়ে দিন” এবং তারপর তিনি তার অধীনে তাঁর (ইবনে আব্বাস) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ তাঁকে কিতাব শিখিয়ে দিন, (আমি আয়নী বলি) এটি একটি মহান ফজিলত এবং ইমাম বুখারী এখানে ফজিলত শব্দটি দ্বারা আলোচনা না করে নিষ্পত্তি করেছেন।[১২৯]

একইভাবে ইমাম বুখারী (রহিঃ) মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশংসা করে একটি মারফু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন অর্থাৎ নৌ অভিযানের হাদীস।[১৩০] “হিন্দ বিনতে আতবা (রা:)” অধ্যায়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর পরিবারের প্রশংসায় আরেকটি মারফু হাদিস এবং “জিকির মুয়াবিয়া”-এ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মওকুফ হাদিস।

সহীহ আল বুখারীতে মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফযীলত সম্বন্ধে সহীহ হাদীস উদ্ধৃত করার পর, আসুন দেখি ইমাম বুখারী (রা.) তাঁর মহাগ্রন্থ “তারিখ আল কাবীর”-এ মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলত নিয়ে কী করেছিলেন।

১. প্রথমে তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আছার উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: “আমি মুয়াবিয়ার চেয়ে (৪ খলিফার খিলাফতের পরে) শাসনের জন্য বেশি উপযুক্ত কাউকে দেখিনি।”

২. তারপর তিনি মারফু হাদিস-এর উদ্ধৃতি দেন যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আল্লাহ! মুয়াবিয়াকে গণিত শেখান এবং তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।”

৩. অতঃপর তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর একটি দোয়া উদ্ধৃত করেন “হে আল্লাহ, তাকে (মুয়াবিয়া) হেদায়েতকারী, পথপ্রদর্শক করুন এবং তার মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করুন।”

৪. অতঃপর তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে তিনি বলেছেন: তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: আমার উম্মতের একদল লোক

[১২৯] উমদাতুল ক্বারী ২৩/৩৯৩।

[১৩০] সহীহ আল-বুখারী ২৯২৪।

আল্লাহর হুকুম মানতে থাকবে এবং যারা তাদের ত্যাগ করবে বা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর হুকুম কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ পুনরুত্থান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত) তারা জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

৫. অতঃপর উমাইর ইবনে সাঈদ (রা.)-এর উক্তিটি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন: ‘মুআবিয়ার কথা ভালো ছাড়া উল্লেখ কোরো না, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: “হে আল্লাহ (অন্যদেরকে হেদায়েত করুন) তার দ্বারা।”

৬. তারপর তিনি মুয়াবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন: নবী কারীম ﷺ বলেছেন: রেশমের জিনিস এবং চিতাবাঘের চামড়ার উপর চড়বে না।

৭. এবং তারপর তিনি ইবনে সিরীনের উক্তিটি উল্লেখ করেছেন যে: মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেননি।[১৩১]

এই সবই প্রমাণ করে যে বুখারী তাঁর ফজিলতের সাথে একমত ছিলেন এবং তিনি এমন কিছু উল্লেখ করেননি যা মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে যায়।

৩. ইবনে হাজার আল আসকালানির সমালোচনা:

ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি দেখুন যা তারা (শিয়ারা) শেয়ার করতে চায় না। ইবনে হাজার আল আসকালানী তাঁর “বাবু যিকরু মুয়াবিয়া (রা.)” এর তাফসীরে বলেছেন :

عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله : ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب ؛ لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه

[১৩১] দেখুন তারীখ আল কাবীর নং ১৪০৫।

والصحبة دالة على الفضل الكثير ، وقد صنف ابن أبي عاصم جزءا في مناقبه ، وكذلك أبو عمر غلام ثعلب ، وأبو بكر النقاش.

বুখারী মানাকিব বা ফাদিলাহ এর পরিবর্তে "যিকার" উল্লেখ করেছেন কারণ এই (নির্দিষ্ট) হাদিসে (বুখারী উদ্ধৃত) কোন ফাদীলাহ নেই তবে ইবনে আব্বাসের আপাত সাক্ষ্য তা'র মহান গুণের প্রমাণ (অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা.) শব্দগুলো মুয়াবিয়া (রা.)-এর জন্য ব্যবহার করেছেন) তিনি ফকীহ এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবী ছিলেন। ইবনে আবি আসিম তাঁর (মুয়াবিয়ার রা.) মানাকিব, আবু উমর গোলাম থা'লাব এবং আবু বকর নাক্কাশও (মানাকিব-এ জুজ লিখেছিলেন)

ফাতহুল বারি গ্রন্থে "জিকির আল মুয়াবিয়া" অধ্যায়ের অধীনে একটি (পৃথক) জুজ লিখেছেন:

তিনি আরো বলেন:

لَكِنْ بدقيق نظره استنبط مَا يدْفع بِهِ رُؤُوس الرَّوَافِض

কিন্তু তাঁর (বুখারীর) গভীর উপলব্ধির সাথে, তিনি (ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আছার থেকে যেখানে তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-কে একজন ছাহাবী ও ফকীহ বলেছেন) রায়টি অনুমান করেছেন, যার কারণে রওয়াফীদের (রাফেজী শিয়াদের) মাথা নত হয়ে যায়।[১৩২]

ইবনে হাজার নিজেই বর্ণনাকারীদের সনদকে সত্যায়িত করেছেন কারণ তিনি সাহাবী আবদুল রহমান ইবনে আবি উমাইরা (রা.)-এর সাহচর্য প্রমাণের জন্য "আল ইসাবা" গ্রন্থে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

১. "হে আল্লাহ! মুয়াবিয়াকে কিতাব ও গণিত শেখান এবং তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেন" এবং তিনি এর বিভিন্ন সূত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন।

২. হিদায়ায় বায়তুল মাকদাসে বায়হ হবে।

১৩২ ফাতহুল বারী, পূর্বোক্ত।

৩. দুনিয়ার সব কিছু দেওয়া হলেও শহীদ ছাড়া কেউ এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায় না।

৪. কোন সফর নেই (অর্থাৎ সফরে কোন অশুভ লক্ষণ নেই) তখন তিনি বলেন :

وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو إسناد منها من مقال فمجموعها يثبت لعبد الرحمن الصحبة.

যদিও এই হাদিসগুলোর সনদে সমস্যা আছে কিন্তু সবই প্রমাণ করে যে, আব্দুর রহমান একজন ছাহাবী ছিলেন [পূর্বোক্ত]। অতঃপর তিনি সেই হাদীছ সম্পর্কে বলেন যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াবিয়া (রাঃ) -এর জন্য দোয়া করেছিলেন:

مع أنه ليست للحديث الأول علّة الاضطراب، فإن رواته ثقات، فقد رواه الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد العزيز، فخالفا أبا مسهر في شيخه، قالا : عن سعيد عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة. أخرجه ابن شاهين، من طريق محمود بن خالد عنهما. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن الوليد بن مسلم.

এর সাথে প্রথম হাদীছে ইদতেরাবের কোন দোষ নেই এবং এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তাই এটি ওয়ালীদ বিন মুসলিম এবং উমর বিন আব্দুল ওয়াহিদ সাঈদ বিন আব্দুল আজিজ থেকে বর্ণনা করেছেন...।[১৩৩]

সুতরাং এটি প্রমাণিত হয়েছে যে ইবনে হাজর ও ইমাম বুখারী (রহ.)'এর মতানুসারে, মুয়াবিয়া (রাঃ)- সম্পর্কিত সকল হাদীস দুর্বল নয়।

১৩৩ আল ইসাবা, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৮।

ইমাম হাসান (রা.)'এর খেলাফত ত্যাগের নেপথ্যে

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)'এর প্রণীত ইতিহাসগ্রন্থটির মধ্যে 'ইমাম হাসান বিন আলী (রা.)'এর প্রতি আনুগত্যের শপথ' শীর্ষক অধ্যায়টি (৪০ হিজরীর ঘটনাবলীর বর্ণনা) পাঠকমণ্ডলী মনোযোগসহ পুরোটুকু পড়ুন (বিশেষ করে পৃষ্ঠা ২-১০, ১৮তম খণ্ড)। ইংরেজি সংস্করণ অনুবাদে গবেষণা করেছিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব ও অনারব অধ্যাপকমণ্ডলী। চল্লিশ খণ্ডের বিশাল বইটি প্রকাশ করেছিলো ইউনেস্কো। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কাজ চলেছিলো। মাঝখানে ইরানে শিয়া বিপ্লব সংঘটিত হলে কাজে ছেদ পড়ে। কেননা গবেষকবৃন্দ ইরানের তাবারিস্তানে যেয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে ইরান সরকার পরে তাঁদেরকে অনুমতি দেন এবং তাঁরা কাজ সুসম্পন্ন করেন।

ইতিহাসগ্রন্থটিতে জানা যায়, হযরত ইমাম হাসান (রা.) ইরাক্ব তথা কুফাবাসীদের গাদ্দারির প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতা আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)'এর বরাবর ছেড়ে দেন। তিনি এর জন্যে তিনটি কারণ ব্যক্ত করেন: ১/ ইমামে আলী (ক.)'এর সাথে গাদ্দারি ও তাঁকে হত্যা; ২/ হযরত ইমাম (রা.)'কে ছুরিকাঘাত (প্রাণ নাশের চেষ্টা) এবং ৩/ মাদাঈনে তাঁর সম্পদ লুণ্ঠন।[১৩৪] বস্তুতঃ তিনি ইতিপূর্বে খলীফা হয়ে ইরাক্ব/কুফাবাসীদের প্রতি কিছু শর্তারোপ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা পূর্ণ আনুগত্যশীল হবে; আমি যার সাথে শান্তি স্থাপন করবো, তার সাথে শান্তি স্থাপন করবে; আর যার সাথে লড়বো, তার সাথে তোমরাও লড়বে।" তারা এ কথায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা বলে, "উনি আমাদের ইমাম নন, কেননা তিনি লড়তে চান না"।[১৩৫] অতঃপর তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয় এবং তাদের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পায়; আর তিনি তাদের তরফ থেকে

[১৩৪] ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) কৃত 'তারীখ', ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫।
[১৩৫] প্রাগুক্ত 'তারীখ', ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭।

শঙ্কিতও হন।[১৩৬] ফলশ্রুতিতে তিনি আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)'এর সাথে সন্ধি করেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

সন্ধিচুক্তি করার সিদ্ধান্তের কথা জানার পরে ইমাম হুসাইন (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.)'কে বলেন তিনি যেনো আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)'এর ভাষ্যে বিশ্বাস না করেন, বরং তাঁদের বাবা ইমামে আলী (ক.)'এর ভাষ্যে বিশ্বাস করেন। হযরত ইমাম (রা.) কড়া প্রত্যুত্তর দেন, "চুপ করো! তুমি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত নও!"[১৩৭] তাঁর এ কথাটা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক হাদীসে ব্যক্ত দুটো বিবদমান মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন ছাড়া কিছু নয়।

শেষ কথা, ইরাক্ব/কুফাবাসীর গাদ্দারি-ই হযরত ইমাম (রা.)'এর খেলাফতের ইতি টানে। তারা আনুগত্যের শপথ নিয়ে উল্টো তাঁকেই হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিলো। সবাই মনে রাখবেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখতে হলে জানবাজ অনুসারী দলের প্রয়োজন হয়। যেমনটি ছিলেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাহাবায়ে কেরাম (রা.); যেমনটি ছিলেন আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)'এর অনুসারী সিরিয়াবাসী; যেমনটি ছিলেন সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (রহ.)'এর মুসলিম বাহিনী। কিন্তু ইরাক্ব/কুফাবাসী এক্ষেত্রে সন্দেহভাজন। ন্যূনতম আনুগত্যও তাদের ছিলো না। ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'কে দাওয়াত করে তাদের এলাকায় নিয়ে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলো! পাপিষ্ঠ এয়াযীদের চেয়েও বেশি দায়ী ছিলো এই গাদ্দারগুলো।[১৩৮]

[১৩৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।
[১৩৭] প্রাগুক্ত 'তারীখ,' ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫।
[১৩৮] লিঙ্ক: https://www.kalamullah.com/.../The.../Tabari_Volume_18.pdf

ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও আহলে বায়ত (রাঃ)-বিষয়ক গবেষণা

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

হিজরী বর্ষের ১০ই মুহর্রম - 'আশুরা' হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। পূর্ববর্তী যুগে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)'মণ্ডলীর জন্যেও এটা বিশেষ দিন ছিলো। কিন্তু এ দিনটির গুরুত্ব চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর নয়নমণি ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর শাহাদাৎ দ্বারা। এ এক দীর্ঘ করুণ ইতিহাস, যা এখানে আলোচনা করবো না। আমি আমাদের দেশে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও কারবালার ঘটনা এবং আহলে বায়ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সম্পর্কে গবেষণা নিয়ে আজকে আলোকপাত করবো।

অনেকে দাবি করেন যে এ রকম গবেষণা আমাদের সুন্নী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তেমন একটা হয়নি। পূর্ববর্তী যুগের আলেম-উলামার বইপত্রও খুব একটা অনূদিত হয়নি। শুধু ২-১টা বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তাও অতি সাম্প্রতিককালে। আসলে সত্য কথা হলো, এই বঙ্গদেশে প্রচুর সুন্নী হক্কানী/রব্বানী আলেম-উলামা আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা গভীর গবেষণা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ইসলামী পূর্ববর্তী যুগের ইমাম-আল্লামাবৃন্দের বইপত্র অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কেননা আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগেও মুসলমান সর্বসাধারণ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, বরঞ্চ উপরোক্ত হক্কানী/রব্বানী আলেম-উলামা ও মাশায়েখবৃন্দের কাঁধে ধর্মীয় বিষয়াদির ফায়সালার দায়িত্ব অর্পণ করতেন এবং নিজেদের দুনিয়াদারির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সেটা ছিলো শান্তির সময়।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকে ধর্মীয় শিক্ষাবিহীন লোকেরাও ধর্মক্ষেত্রে তথাকথিত 'গবেষণা' আরম্ভ করেছে এবং বাতিল মতবাদে দীক্ষা নিয়ে অতি চালাকি করে এজেন্ডা বাস্তবায়নে নেমেছে। পরিস্থিতি আরো নাজুক

হয়েছে পেট্রো-ডলারসমৃদ্ধ সৌদি/নজদী ওহাবীপন্থী রাষ্ট্র ও রাফেযী শিয়াপন্থী ইরান রাষ্ট্রের আর্থিক মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এই ১০ই মুহর্রম তারিখের হযরতে ইমামে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর শাহাদাতে কারবালা নিয়েই উপরোক্ত দুটো 'লবী' কী রকম আক্বীদা-বিরোধী প্রচারণায় অপতৎপর তা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। এক দল হন্তা এয়াযীদকে 'সত্যপন্থী' দাবি করছে; আরেক দল তার দোষ দেখিয়ে তার বাবা সাহাবী হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'কে 'ষড়যন্ত্রকারী ও মুনাফেক্ব' দাবি করছে এবং আহলে বায়ত ও আসহাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)-বৃন্দের মাঝে কল্পিত দ্বন্দ্বের এক মিথ্যাচার দ্বারা সুন্নী মুসলমান সমাজকে বিভক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এসব-ই ফেইসবুকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সুন্নী আলেম-উলামাবৃন্দের কথার প্রতি কর্ণপাতও করা হচ্ছে না।

তবে সুখবর হলো, ইদানীং বেশ কিছু সুন্নী আলেম বিষয়টি নিয়ে বইপত্র লিখছেন এবং পূর্ববর্তী যুগের ইমাম/আল্লামা-মণ্ডলীর কিতাবসমূহের অনুবাদকর্মেও হাত দিয়েছেন। আমার সুপরিচিত ড: ইউসুফ জিলানীভাই ও তরুণ গবেষক মওলানা শহীদুল্লাহ বাহাদুরভাইয়ের নাম এখানে প্রণিধানযোগ্য। আমি নিজেও ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুযায়ী কিছু লেখা অনুবাদ করেছি, যা আমার প্রকাশিত 'ফাদাক বাগান' ও অন্যান্য বইপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এভাবে সুন্নী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ফায়সালা দেয়া হলে এ দেশের মুসলমান সমাজে আর বিভ্রান্তি থাকবে না বলে আমি আশাবাদী, ইন-শা-আল্লাহ।

শেষ কথা হলো, ইতিপূর্বে গবেষণা হয়নি মর্মে দাবি করে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সুন্নী বুযূর্গ-উলামা ও মাশায়েখ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম)-মণ্ডলীর মহৎ কীর্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা কোনো মুসলমানের পক্ষে শোভনীয় কাজ নয়। বরং এ ধরনের কর্মকাণ্ড বাতিলপন্থীদের অসৎ ও দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

জরুরি জ্ঞাতব্য

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পবিত্র সোহবত/সান্নিধ্য দ্বারা হযরতে ইমামে আলী (ক.) এতোই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন যে গাছ-পাথর-পাহাড় প্রভৃতির সালাম-সম্ভাষণ তিনি বুঝতে সক্ষম ছিলেন। এই মক্বাম স্রেফ বংশীয় সূত্রে লাভ হয় না, বরঞ্চ সোহবত ও কুরবাত/নৈকট্য দ্বারাই অর্জিত হয়। নতুবা আবূ লাহাব ও আবূ জেহেল বংশীয় সূত্রে উঁচু মক্বামে অধিষ্ঠিত হতো। কেননা তারা ছিলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর চাচা! কিন্তু তাঁর সোহবত ও কুরবাত গ্রহণ না করার দরুন তারা জাহান্নামী। অতএব, বাতিল রাফিযী শিয়াচক্রের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে আহলে বাইত (রা.)-এর সদস্যবৃন্দ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সোহবত ও কুরবাত লাভ করেই উঁচু মক্বামে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, স্রেফ বংশগত কারণে তা হননি। এ কারণেই বিভিন্ন তরীক্বতের মাশায়েখ আল-কিরাম (রহ.) সোহবতের ওপর জোর দিয়েছেন বেশি। এ থেকে বঞ্চিত কতিপয় 'সৈয়দজাদা-কেও' আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে দেখেছি আমি। অতএব, মুসলমান সাধারণ সাবধান!

হযরত যায়দ (রা.)'কে 'মওলা' সম্বোধনবিষয়ক হাদীস

উক্ত হাদীসটি সম্প্রতি আমার ফেইসবুকের টাইমলাইনে একটি পোষ্টে উদ্ধৃত হয়েছে। অতঃপর জনৈক সুন্নী-ছদ্মবেশী শিয়াপক্ষীয় ব্যক্তি আমার মন্তব্য ফোরামে এসে তওহীদ পাবলিকেশন ও আধুনিক প্রকাশনীর অনলাইন হাদীস সংকলনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল-বুখারী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসটির বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে "আযাদকৃত গোলাম।" এমতাবস্থায় আমি একই ওয়েবসাইট (হাদীসবিডি.কম)-এর 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের মধ্যে একযোগে সর্ব-হযরত বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহিম)-এর বর্ণিত একই হাদীসের এবারত/উদ্ধৃতি যাচাই করলাম। কী আশ্চর্য! তাতে বাংলা ভাষান্তর পাওয়া গেলো "প্রিয়ভাজন (বন্ধু)।"[১৩৯]

আমি জানি তওহীদ পাবলিকেশন ও আধুনিক প্রকাশনী ভ্রান্ত সালাফী/মওদূদীবাদী গোষ্ঠীর প্রকাশনা সংস্থা, যাদের সাথে শিয়া গোমরাহদের এ ব্যাপারে মতবাদগত মিল রয়েছে। তারা হাদীসটি অনুবাদে বিকৃতি সাধন করবেই। তাই আমি আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটগুলো চেক/যাচাই করা আরম্ভ করি। সুন্নী একটি সাইটে পাওয়া গেলো একখানা লেখা যার উদ্ধৃতি নিম্নরূপ: শিয়া অপযুক্তি নং ৩ - প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ছাড়াও অন্য কাউকে 'মওলা' শব্দটি দ্বারা সম্বোধন করেছেন? সুন্নীদের উত্তর: হ্যাঁ, অন্যদের ক্ষেত্রেও তা করেছেন। অতঃপর দুটি উদাহরণ এতে পেশ করা হয়েছে যার একটি-

وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.

অর্থ: "তুমি (যায়দ) আমাদের ভাই ও আমাদের মওলা।"[১৪০]

---

১৩৯ দেখুন লিঙ্ক – https://www.hadithbd.net/hadith/link/?id=68704...

১৪০ দেখুন সাইট লিঙ্ক: https://youpuncturedtheark.wordpress.com/.../the.../...

অতঃপর 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের উক্ত ৩৩৭৭ নং হাদীসের উর্দূ অনুবাদ আরেকটি সাইটে পেলাম। তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে-

تم ہمارے بھائی اور ہمارے چہیتے ہو

বাংলা অর্থ (গুগল): তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের প্রিয়ভাজন (বন্ধু)।[১৪১]

অতএব, আমরা সুন্নীরা আমাদের বক্তব্যে অটল, অবিচল। সবাইকে হাদীস বিকৃতির ব্যাপারে সতর্ক করছি। হাদীসবিডি-ডট-কম সাইট কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একই হাদীসের তরজমা দু রকম কেন? সংশ্লিষ্টরা জবাব দেবেন কি?

ভুল অনুবাদ

আন্তর্জাতিক সালাফীদের হাদীসের ইংরেজি সাইট 'সুন্নাহ-ডট-কম।' তারা মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৩৭৭ নং হাদীসে 'মওলা' শব্দটির অনুবাদ করেছে - Client - যা আমেরিকান চেইমবার্স ডিকশানারীতে অর্থ করা হয়েছে - Dependent (পালক/পোষ্য) শব্দ দ্বারা। হাদীসবিডি-ডট-কম এই ইংরেজি সালাফী সাইটকেই অনুসরণ করে, কিন্তু এখানে তারা অনুবাদে মারাত্মক ভুল করেছে![১৪২]

হাদীসের বিকৃতি

হযরত যায়দ (রা.)-এর প্রতি 'মওলা' শব্দের প্রায়োগিক অর্থ বুঝতে হলে হাদীসটির ভাব, অর্থাৎ, কী বোঝানো হয়েছে তা অনুধাবন করতে হবে। তাই হাদীসটি উদ্ধৃত করছি - "অতঃপর ওই কন্যার লালন-পালনে 'আলী , যায়দ ও জা'ফার - এই তিনজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। 'আলী বললেন, আমিই তাকে প্রথম উঠিয়েছি এবং সে আমার চাচাত বোন। জা'ফার বললেন, সে তো আমারও চাচাত বোন এবং তার খালা আমার

[১৪১] দেখুন সাইট লিঙ্কঃ https://www.socioon.com/.../mishkat-al.../hadees-no-3377

[১৪২] দেখুন ইংরেজি সংস্করণ - https://sunnah.com/mishkat:3377

সহধর্মিণী। যায়দ বললেন, সে তো আমার ভাতিজি। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালার পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, খালা মাতৃসম। অতঃপর 'আলীকে বললেন, তুমি আমার, আমি তোমার (আপনজন)। জা'ফারকে বললেন, তুমি আমার শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক গুণের সাদৃশ্যের অধিকারী। আর যায়দকে বললেন, তুমি আমারই ভাই, আমাদের প্রিয়তম।" প্রিয়নবী (ﷺ) তিনজনকেই সান্ত্বনাসূচক প্রশংসাপূর্ণ কথা বলেছিলেন। অতএব, সালাফীদের অনূদিত 'আযাদকৃত গোলাম' কথাটি হাদীসের ভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা তা গ্লানিকর।[১৪৩]

[১৪৩] দেখুন হাদীসের বিকৃতির লিঙ্কঃ https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=26838&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1pTkBHMBz-kqPtmZgaLHF5V46XvDp7Iilz2n8DTS3gJlLshGY4vvLklaI_aem_jN2kyeWe6fJ80sUPsx_jGg

আমীরে মু'আবিয়া (রা:) কেন তাঁর ছেলে এয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করেন?

মূল: ইসলাম প্রশ্ন ও উত্তর ওয়েবসাইট

আরবী রিসোর্স: মাওলানা মুহাম্মদ রুবাইয়াৎ বিন মূসা

[Bengali translation of Islam Question and Answer website's religious verdict - 186682: Why did Mu'awiyah (may Allah be pleased with him) appoint his son Yazeed as his successor to the caliphate?]

প্রশ্ন: আমাদের জানা মোতাবেক, ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খেলাফতের শাসনভার আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বরাবরে হস্তান্তরের পরে তাঁরা দু জনই একমত হন যে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বেসাল শরীফ হলে খলীফা নির্বাচিত হবেন শূরা (পরামর্শক সভা)'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তাহলে কেন আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বেসালের পরে এয়াযীদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে? আরেক কথায়, এটা কি ওই সাহাবা দু জন যে সিদ্ধান্তের ওপর একমত হয়েছিলেন, তার স্পষ্ট লঙ্ঘন নয়? নাকি আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর এই মর্মে আশঙ্কা ছিলো যে মুসলমানদের মধ্যে আবারো অশান্তি দেখা দেবে, যার কারণে তিনি নিজ পুত্র এয়াযীদকে উত্তরাধিকারীস্বরূপ খলীফা মনোনীত করেছিলেন?

উত্তর: আল্লাহরই প্রতি সমস্ত প্রশংসা।

প্রথমতঃ মহান এই সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন কাতেবে ওহী (ওহী লেখক); তিনি তাঁর ধৈর্য, জ্ঞান ও গুণের জন্যে সুপরিচিত ছিলেন, আর তাঁর অর্জন ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো প্রচুর। তাঁর প্রতি কলঙ্কলেপন বা কুৎসা রটনা করার কোনো অনুমতি-ই নেই। তিনি ছিলেন মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমনই একজন, যিনি আপন সাধ্যানুযায়ী ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শাসন করতেন। তাঁর সময়কার অশান্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে যা যা ঘটেছিলো, মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের

উচিত হবে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবী-ই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সৎ ও ধার্মিক ছিলেন; তাঁদের «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ» যে কেউ এজতেহাদ তথা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত দ্বারা সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে সফল হলে দুটি সওয়াব পাবেন, আর এজতেহাদ প্রয়োগে ভুল করলে সওয়াব পাবেন একটি।[১৪৪] [অনুগ্রহ করে আমাদের ১৪০৯৮৪ নং ফতোয়াটি দেখুন]

দ্বিতীয়তঃ হযরতে ইমামে আলী কাররামা আল্লাহু ওয়াজহুল করীম যখন বেসালপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর পুত্র ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযা পড়েন, তখন মানুষেরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন, আর তাঁরা সিরীয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্যে তাঁর কাছে জোরালো আবেদন জানান।

ثُمَّ رَكِبَ الْحَسَنُ فِي جُنُودِ الْعِرَاقِ عَنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ، وَرَكِبَ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الشَّامِ .فلمَّا تَوَاجَهَ الْجَيْشَانِ وَتَقَابَلَ الْفَرِيقَانِ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا فِي الصُّلْحِ فَانْتَهَى الْحَالُ إِلَى أَنْ خَلَعَ الْحَسَنُ نَفْسَهُ مِنَ الْخِلَافَةِ وَسَلَّمَ الْمُلْكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.

কিন্তু কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও মানুষের পীড়াপীড়িতে তিনি এ কাজে বাধ্য হন, যার দরুন ইতিপূর্বে দেখা যায়নি এমন বিশাল এক সেনাবাহিনী গঠিত হয়। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওই সৈন্যবাহিনীসহ সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। ইত্যবসরে তাঁর বাহিনীর ভেতরে মতপার্থক্য ও বিভেদ দেখা দেয়। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন বুঝতে পারেন তাঁর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীটি একতাবদ্ধ নয়, তখন তিনি তাদের প্রতি বিরক্ত হন এবং আমীরে মু'আবিয়া

[১৪৪] (ক) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, ১:১৯৪ হাদীস নং ২২৮।
(খ) আবু উয়ানা : আল মুসনাদ, ৪:১৬৮ হাদীস নং ৬৩৯৭।
(গ) বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়াত, ৭:১৮৫।

ইবনে আবী সুফইয়ানের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে শান্তিচুক্তির শর্ত দিয়ে পত্র লেখেন।[১৪৫]

আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে (দূত হিসেবে) আবদুল্লাহ ইবনে আমির ও আবদুর রাহমান ইবনে সামুরাহ'কে প্রেরণ করেন এবং এর ফলে একটি শান্তিচুক্তি বলবৎ হয়।

وَذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ، فَبَايَعَهُ الْأُمَرَاءُ مِنَ الْجَيْشَيْنِ، واستقلَّ بِأَعْبَاءِ الأُمَّة، فسمِّي ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ الْجَمَاعَةِ،

এই ঘটনা ৪০ হিজরী সালের, যাকে 'আম আল-জামা'আহ' (ঐক্যর বছর) বলা হয়; কেননা মানুষেরা হযরতে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হন।[১৪৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং (একটি হাদীসে) ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই কারণে যে তিনি নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং কখনোই তা আর কামনা করেননি; যার দরুন মুসলমানদের রক্তক্ষয় বন্ধ হয় এবং তিনিও আল্লাহর রেযামন্দি হাসিলে সমর্পিত হন। অতএব, ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খেলাফত ত্যাগ করেন এবং এর কর্তৃত্বভার আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে অর্পণ করেন, যাতে মুসলমান জনগণ একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন।

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা (সাইটের ফতোয়া নং ২৭০৪ দ্রষ্টব্য) করেন যে আবূ বাকরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ».

[১৪৫] ইবনে কাছির : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:২৩।

[১৪৬] ইবনে কাছির : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬:২৪৬।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বরে দেখতে পেলাম, তাঁর পাশে ছিলেন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু; আর তিনি কখনো মানুষের দিকে, আবার কখনো ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে মুখ মোবারক ফেরাচ্ছিলেন; অতঃপর তিনি বলেন, "আমার এই পুত্র সাইয়্যেদ (সর্দার) হবে, আর হয়তো আল্লাহ পাক তারই মাধ্যমে দুটি বিশাল মুসলমান সেনাবাহিনীকে একতাবদ্ধ করবেন।[১৪৭]

وَلَمَّا تَسَلَّمَ مُعَاوِيَةُ الْبِلَادَ وَدَخَلَ الْكُوفَةَ وَخَطَبَ بِهَا وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ فِي سَائِرِ الْأَقَالِيمِ وَالْآفَاقِ، وَحَصَلَ عَلَى بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ عامئذٍ الْإِجْمَاعُ وَالِاتِّفَاقُ،

আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হয়ে কুফাহ নগরীতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে এক ভাষণ দেন, যার ফলশ্রুতিতে সারা আরব জাহানের মানুষ তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হন।

تَرَحَّلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَعَهُ أَخُوهُ الْحُسَيْنُ وَبَقِيَّةُ إِخْوَتِهِمْ وَابْنُ عَمِّهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ إِلَى أَرْضِ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ.

ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ভাই ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁদের অন্যান্য ভাই ও চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইরাক্ব হতে সফর করে মদীনা মোনাওয়ারায় যান।[১৪৮]

জীবন সায়াহ্নে এসে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজ পুত্র এয়াযীদকে ডেকে পাঠান এবং তাকে চূড়ান্ত নির্দেশনা দেন, আর মানুষেরা

[১৪৭] (ক) বুখারী : আস সহীহ, বাবু কাওলিন নবীয়্যি লিল হাসান, ৩:১৮৬ হাদীস নং ২৭০৪।
(খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৬:৩৭৮ হাদীস নং ৩২১৭৮।
(গ) আহমদ : আল মুসনাদ, ৫:৩৭ হাদীস নং ২০৪০৮।
(ঘ) আবু দাউদ : আস সুনান, ৪:২১৬ হাদীস নং ৪৬৬২।
(ঙ) তিরমিযী : আস সুনান, ৬:১২১ হাদীস নং ৩৭৭৩।
(চ) বাযযার : আল মুসনাদ, ৯:১০৯।
(ছ) নাসায়ী : আস সুনান আল কুবরা, ২:২৮১ হাদীস নং ১৭৩০।
(জ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৫:৪১৯।
(ঝ) তাবারানী : আল মু'জামুল আওসাত, ২:১৪৭ হাদীস নং ১৫৩১।

[১৪৮] ইবনে কাছির : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৬-২০।

এয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সর্ব-হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মতো অনেক সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম; তবে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এয়াযীদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি হননি।[১৪৯]

ইবনে বাত্তাল রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

فسلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على السمع والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، ثم دخلا الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه على أهل العراقين، فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم وانقطاع الحرب وبايع معاوية كلُ من كان معتزلا عنه، وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، وتباشر الناس بذلك، وأجاز معاوية الحسن بن على بثلاثمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبدا ومائة جمل، وانصرف الحسن بن على إلى المدينة وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة، وولى البصرة عبد الله بن عامر، وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته.

ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করেন ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে তিনি আল্লাহ'র কিতাব/ঐশীগ্রন্থ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসারে শাসন করবেন। অতঃপর তাঁরা কুফাহ নগরীতে প্রবেশ করেন এবং ইরাক্বাসী আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। সেটা ছিলো ঐক্যের বছর, যখন মানুষেরা একতাবদ্ধ হন এবং একটি সমঝোতায় পৌঁছেন, আর যুদ্ধ-ও বন্ধ হয়। যে সকল সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এই গৃহযুদ্ধ হতে বিরত ছিলেন, তাঁরাও এসে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে বাইয়াত হন। সর্ব-হযরত

[১৪৯] ইবনে কাছির : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৬-২০ ও ৮:১৭৫।

সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন, আর সর্বসাধারণ এ ব্যাপারে খুব খুশি হন। হযরত মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে তিন লক্ষ দিনার, এক সহস্র বস্ত্র, ত্রিশ জন গোলাম ও এক শটি উট উপহার দেন, আর ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদীনা মোনাওয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফাহ'র প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে আল-মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ'কে এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমিরকে বসরা নগরীর শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। অতঃপর তাঁর শাসনাধীন রাষ্ট্রের জন্যে গৃহীত রাজধানী দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে তিনি রওয়ানা হন।[১৫০]

তৃতীয়তঃ উলামাবৃন্দ বিবৃত করেন যে ইমাম হাসান ইবনে আলী কাররামা আল্লাহু ওয়াজহুল করীম শর্তারোপ করেছিলেন এই মর্মে যে আমীরে মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাউকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত বা নিয়োগ করতে পারবেন না; বরঞ্চ তা মুসলমানদের পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হবে।

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَلما تصالحا كتب بِهِ الْحسن كتابا لمعاوية صورته

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا مَا صَالح عَلَيْهِ الْحسن بن عَليّ رَضِي الله عَنْهُمَا مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان

صَالحه على أَن يسلم إِلَيْهِ ولَايَة الْمُسلمين على أَن يعْمل فيهم بِكِتَاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسيرة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين وَلَيْسَ لمعاوية بن أبي سُفْيَان أَن يعْهَد إِلَى أحد من بعده عهدا بل يكون الْأَمر من بعده شُورَى بَين الْمُسلمين وعَلى أَن النَّاس آمنون حَيْثُ كَانُوا

[১৫০] ইবনে বাত্তাল : শরহে সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থের ৮:৯৭ উদ্ধৃতির সমাপ্তি।

من أَرض الله تَعَالَى فِي شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم وعَلى أَن أَصْحَاب عَلِيّ وشيعته آمنون على أنفسهم وَأَمْوَالهمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَوْلَادهمْ حَيْثُ كَانُوا وعَلى مُعَاوِيَة بن ابي سُفْيَان بذلك عهد الله وميثاقه وَأَن لَا يَبْتَغِي لِلْحسنِ بن عَلِيّ وَلَا لِأَخِيهِ الْحُسَيْن وَلَا لأحد من أهل بَيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غائلة سرا وَلَا جهرا وَلَا يخيف أحدا مِنْهُم فِي أفق من الْآفَاق أشهد عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان بن فلَان وَكفى بِاللَّه شَهِيدا وَلما انبرم الصُّلْح التمس مُعَاوِيَة من الْحسن أَن يتَكَلَّم بِجمع من النَّاس وَيُعلمهُم أَنه قد بَايع مُعَاوِيَة وَسلم إِلَيْهِ الْأَمر فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِك.

দু জনের মাঝে শান্তি স্থাপিত হলে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে (উদ্দেশ্য করে) একটি দলিলে লেখেন: পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ)। এই হলো দলিল যার ব্যাপারে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একমত। তিনি উনার সাথে একটি শান্তিচুক্তি করেছেন এই মর্মে যে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে মুসলমানদেরকে শাসন করার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এই শর্তে যে তিনি আল্লাহ'র কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফাদের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের) পদাঙ্ক-অনুসরণে রাষ্ট্র শাসন করবেন। উত্তরাধিকারী নির্বাচনে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কোনো হক্ক নেই; বরঞ্চ এই বিষয়টি মুসলমানদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও শূরা (পরামর্শ)'র ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। [এই চুক্তির আওতায় এ-ও] নিশ্চিত করতে হবে যে সর্বসাধারণ সিরিয়া, ইরাক্ব, হেজায বা ইয়েমেনসহ আল্লাহর দুনিয়ার যেখানেই বসবাস করুন না কেন, তাঁদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। আরো শর্ত থাকবে যে সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও ইমামে আলী কাররামা আল্লাহু ওয়াজহুহুল করীম-এর খানদান নিরাপদ থাকবেন, আর তাঁদের জান, মাল, নারী ও শিশু যেখানেই থাকুন না কেন, সবাই

নিরাপদ থাকবেন। মু'আবিয়াহ ইবনে আবী সুফইয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সামনে এই মর্মে তাঁর দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন; আর তিনি ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বা তাঁর ভাই ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিংবা আহলে বায়তে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার আক্রোশ পোষণ করেন না; আর তাঁরা যেখানেই থাকুন, তিনি তাঁদেরকে হয়রানিও করবেন না।

এই বিষয়টির সাক্ষী অমুক-অমুক, তাদের পিতা অমুক-অমুক, আর আল্লাহতা'লাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে আমীরে মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে মানুষের সমাবেশে তাঁর এই ক্ষমতা হস্তান্তর ও আনুগত্যের শপথের কথা জানিয়ে ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি তাতে সম্মত হন।[১৫১]

এছাড়াও ডঃ আল-সাল্লাবী রচিত 'আল-হাসান ইবনে আলী কাররামা আল্লাহু ওয়াজহু' পুস্তকটি (২৫৩ পৃষ্ঠা) দেখুন।[১৫২]

চতুর্থতঃ আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন মানুষের মধ্যে মতভেদ, বিভক্তি ও অশান্তির ব্যাপ্তি দেখতে পান এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রবণতার ব্যাপ্তিও অবলোকন করেন, তখন তিনি তাঁর বেসালের পরে তাদের বিভক্তি আরো ব্যাপকতর হবার আশঙ্কা করেন; তিনি আরো আশঙ্কা করেন যে এই মতপার্থক্য ও অশান্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন এর সেরা সমাধান হলো তাঁর (বেসালের) পরে নিজের ছেলে এয়াযীদের প্রতি মানুষের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করানো। তিনি এতদুদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ সাহাবাবৃন্দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, জননেতৃবৃন্দ ও এলাকাগুলোর গভর্নরদের সাথে পরামর্শ করেন। এমতাবস্থায় তাঁরা সবাই এতে সম্মতি দেন। প্রতিনিধিদলগুলো এসে এয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের

১৫১ ইবনে হাজর হায়তামী : আল-সাওয়াইক্ব আল-মোহরিক্বাহ 'আলা আহলে আর-রাফয ওয়াদ-দালা'ল ওয়ায-যানদাক্বাহ' পুস্তকের উদ্ধৃতি (২:৩৯৯) সমাপ্ত।

১৫২ বইটির ইংরেজি সংস্করণের শিরোনাম 'Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib:His Life and Times'

শপথ নেয়, বহু সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-ও ওই শপথ নেন, যার দরুন হাফেয আবদুল গনী আল-মাক্বদিসী বলেন:

خلافته صحيحة ، بايعه ستون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر.

তার (এয়াযীদের) খেলাফত বৈধ ছিলো; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাবৃন্দের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-সহ ৬০ জন সাহাবা (রা:) এয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন।[১৫৩]

সহীহ বুখারী শরীফে (ওয়েবসাইটের ৭১১১ নং ফতোয়ায়) এ কথা প্রমাণিত যে হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। না'ফী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত,

لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

তিনি বলেন: মদীনাবাসী মুসলমান সাধারণ যখন ঘোষণা করেন যে তাঁরা এয়াযীদকে খলীফা হিসেবে আর গ্রহণ করবেন না, তখন হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও সন্তানদেরকে জড়ো করে বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে বলতে শুনেছি, "ক্বেয়ামত দিবসে প্রত্যেক বেঈমান তথা বিশ্বাসঘাতকের জন্যে একটি পতাকা স্থাপিত হবে।" আমরা এই ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের শপথ

[১৫৩] এয়াযীদের খেলাফত বৈধ ছিলো মর্মে ইমাম আবদুল গণী নাবলূসী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো হযরতে আমীরে মু'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনুসৃত পদ্ধতিটি বৈধ ছিলো। কিন্তু এয়াযীদ ক্ষমতা গ্রহণের পরে যা করেছে তার পক্ষে এ বক্তব্য নয়।

নিয়েছি আল্লাহতা'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরোপিত শর্তানুযায়ী; আর আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরোপিত শর্তানুসারে আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারী ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি বেঈমান কাউকে চিনি না, যে ওইভাবে শপথ নেয়ার পরে তার (মানে নেতার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। যদি আমি জানতে পারি যে তোমাদের (মানে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের) মধ্যে কেউ তার (এয়াযীদের) প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেছো বা অন্য কারোর আনুগত্য স্বীকার করেছো, তাহলে সেটাই হবে আমার সাথে তার সম্পর্কের পরিসমাপ্তি।

ولعل السبب الذي دفع معاوية لأخذ البيعة ليزيد، أنه رأى أن يمنع الخلاف ، ويجمع الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأمة ، مع نظره لكثرة المطالبين بالخلافة ، فرأى رضي الله عنه أن في توليته ليزيد صلاحا للأمة ، وقطعاً لدابر الفتنة باتفاق أهل الحل والعقد عليه.

হয়তো এয়াযীদের প্রতি মানুষের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের পক্ষে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বক্তব্যের পেছনে এই কারণ হতে পারে যে তিনি ভেবেছিলেন এতে বিভক্তি রোধ হবে এবং উম্মতের ওই সঙ্কটকালে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে। কেননা খেলাফতের অনেক দাবিদারের ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন এয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করাটা উম্মতের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা, আর এটা অশান্তি দূর করার বেলায়ও একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যদি নীতিনির্ধারকমণ্ডলী এয়াযীদের ব্যাপারে একমত হন।[১৫৪]

ইবনে খালদূন বলেন:

والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس، واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه

[১৫৪] আলী ইবনে নায়িফ : 'আল্ মোফাসসাল ফীর-রাদ্দে 'আলা শুবাহাত আ'দা' আল-ইসলাম', ১৩:২২৮।

حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ، لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع، وأهل الغلب منهم. فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك، وعدالتهم مانعة منه.

এয়াযীদকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া এবং খলীফা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে যে বিষয়টি প্রণোদিত করেছিলো, তা হলো এই বিশ্বাস যে এতে মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য ও একজন নেতার অধীনে শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের স্বার্থের সংরক্ষণ হবে, যা ওই সময়কার নীতিনির্ধারক বনূ উমাইয়া গোত্রের অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। কেননা বনূ উমাইয়া সে সময় নিজেদের গোত্রভুক্ত কেউ ছাড়া (খলীফা হিসেবে) অন্য কাউকেই মেনে নিতো না। তারা ছিলো কুরাইশ বংশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র, আর তাদের ছিলো ব্যাপক প্রভাব। তাই আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এয়াযীদকে পছন্দ করেন তাঁদের চেয়েও, যাঁরা হয়তো মনে করেছিলেন তাঁরা তার চেয়ে বেশি যোগ্য। এই কারণেই আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বেশি সৎ ও ধার্মিকদের চেয়ে কম সৎ ও ধার্মিক একজনকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কেননা তিনি মুসলমানদেরকে একজন নেতার অধীনে একতাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছিলেন, যা ইসলামী শিক্ষায় একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ক্ষেত্রে এ ছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য চিন্তা করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁর সৎ চরিত্র ও সাহাবী হওয়ার বাস্তবতা-ই অন্য কোনো উদ্দেশ্যকে নাকচ করে দেয়।

কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর সেখানে উপস্থিত থাকা এবং তাঁদের নিরবতা পালন করার ঘটনা ইঙ্গিত করে যে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যা করেছিলেন, তার মধ্যে কোনো সন্দেহজনক কিছু ছিলো না। কারণ ওই সকল পুণ্যাত্মা ভুল কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষেত্রে ভয় পাবার মতো কেউ ছিলেন না। আর আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও সত্য কথা গ্রহণ না করার মতো দাম্ভিক লোকদের একজন ছিলেন না। তাঁদের সবাই এতো উন্নতচরিত্রের ছিলেন যে ওই রকম আচরণ তাঁরা করতেই পারতেন না, আর তাঁদের সততা ওই হীন কাজকে বাতিল করে দিতো।[১৫৫]

ইবনে খালদূন আরো বলেন:

عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة.

আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের বিভক্তির আশঙ্কায় এয়াযীদকে খলীফা হবার ব্যাপারে নির্দেশনা দেন।[১৫৬]

মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব রহমতুল্লাহি আলাইহি 'আল-আওয়াসিম মিন আল-ক্বাওয়া'সিম' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (২২৯ পৃষ্ঠা) বলেন:

عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى ، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه.

আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেরাটা বেছে নেননি, কেননা শূরা (পারস্পরিক পরামর্শক সভা)'র বরাবরে এই বিষয়টিকে রেখে গেলে অশান্তি ও রক্তক্ষয় হবে বলে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যারা তাঁর ছেলের পক্ষে থাকবেন, তাদের হাতেই থাকবে ক্ষমতা, বাধ্যতা বজায় রাখা, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা (অর্থাৎ, তারা ক্ষমতাশালী হওয়ার দরুন নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন)। [উদ্ধৃতির সমাপ্তি]

[১৫৫] ইবনে খালদূন : মোক্বাদ্দিমাত (১০৯ পৃষ্ঠা) পুস্তকের উদ্ধৃতি সমাপ্ত।
[১৫৬] ইবনে খালদূন : মোক্বাদ্দিমাত (১০৬ পৃষ্ঠা) পুস্তকের উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

পরিশেষে বলবো, বিভেদের সময় যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিস্থিতি অশান্ত ছিলো, তখন উম্মতের স্বার্থে যা শ্রেয়তর তা-ই আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন; আর তিনি ভেবেছিলেন মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ও অশান্তি দূর করাটা ওই শর্ত পূরণ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, যা আরোপ করেছিলেন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যখনই তিনি খেলাফতের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। শরীয়ত সেই বিষয়-ই অর্জন করতে এবং পূর্ণতা দিতে চায়, যা মানুষের স্বার্থ সেরা উপায়ে সংরক্ষণ করে এবং যা ক্ষতিকর তাকেও নিবৃত্ত করে ও কমিয়ে আনে।

এই বিষয়ে সর্বোপরি যা বলা যায় তা হলো, মুসলমানদের খলীফা হযরতে আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেরা উপায়টি বেছে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দুটি সওয়াব পাবেন, আর ভুল করলে সওয়াব পাবেন একটি, ইনশা'আল্লাহ। এই বিষয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অপূর্ণতা ও ঘাটতি (থেকে থাকলে তা একমাত্র) পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহতা'লা-ই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাবৃন্দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-ই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী মহান আল্লাহতা'লা কর্তৃক মাফ পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য।

আর আল্লাহ পাক-ই সবচেয়ে ভালো জানেন।

হযরত মু'য়াবিয়া (রা.) উত্তরাধিকারী নির্বাচনে জুলুম করেছিলেন কি?

বর্তমানে ফেসবুক ও অনলাইনে হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে পারসিক শিয়া গোষ্ঠীর চামচা দল নিরন্তর আক্রমণ করে চলেছে এ অভিযোগে যে, তিনি নিজের ছেলে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলামে রাজতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। আর এতে তিনি জোরজবরদস্তি বিশিষ্ট সাহাবা (রা.)-বৃন্দের ও গণমান্যদের সম্মতি গ্রহণ করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক! চলুন, কথা না বাড়িয়ে মূল অলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

হাদীসে 'খলীফা' সম্বোধন:

রাজা-বাদশাহ নন, বরং খলীফা বলে সম্বোধন করেছিলেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হযরত জাবের (রা:) বলেন:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً)) ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ((كلهم من قريش)) وهذا لفظ مسلم.

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শুনেছি এ কথা বলতে: "মানুষের বিষয়াদি (উন্নত হতে) থাকবে বারো জনের নেতৃত্বে...।" এরপর তিনি এমন কথা বলেন যা আমি (কানে) শুনতে পাইনি। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী বলেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন, "তাঁরা (শাসকবৃন্দ) সবাই কুরাইশ গোত্রভুক্ত।"[১৫৭]

---

[১৫৭] আল-বুখারী, হাদীস নং ৭২২২, ৭২২৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৮২১।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৮২১) হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা:) হতে ইমাম হুসাইন (রা:)-এর সূত্রে আলাদা শব্দচয়নে বর্ণনা করেন:

(إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة).

"বস্তুতঃ এই বিষয়টি রহিত হবে না, যতোক্ষণ না বারো জন খলীফা তাদের ওপরে শাসন করবে।"

হযরত জাবের (রা:) হতে সিমাকের সূত্রেও ভিন্ন শব্দচয়নে বর্ণিত হয়:

(لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة) ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: (كلهم من قريش).

"ইসলাম বারো জন খলীফার শাসনকাল পর্যন্ত শক্তিশালী হতে থাকবে।" এরপর মহানবী (দ:) কিছু একটা বলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি রাসূলুল্লাহ (দ:) কী বলেছিলেন। তিনি জবাবে বলেন, "তাঁরা (শাসকবৃন্দ) সবাই ক্বুরাইশ গোত্রীয় হবেন।"

হযরত জাবের (রা:) হতে আল-শাবী'র সূত্রে অন্যভাবে বর্ণিত:

(لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة).

"বারো জন খলীফার মাধ্যমে (শাসনের) এই বিষয়টি শক্তিশালী থাকবে।"

ইমাম মুসলিম (রহ:) তাঁর পুস্তকে (১৮২২) আমির ইবনে সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রহ:)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন যে হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা:) তাঁর গোলাম নাফী'র মাধ্যমে লেখা পত্র দ্বারা তাঁকে জানিয়েছেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে বলতে শুনেছেন:

(لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشرة خليفة كلهم من قريش).

ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য বজায় রাখবে প্রলয় দিবস অবধি; কিংবা বারো জন খলীফা তোমাদেরকে শাসন করা পর্যন্ত। তারা সবাই ক্বুরাইশ গোত্রভুক্ত হবে।

অতএব, এসব রওয়ায়াতের স্পষ্ট অর্থের ভিত্তিতে হযরতে আমীরে মু'আবিয়া (রা:) এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, কেননা তিনি ক্বুরাইশ গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং তিনি শাসন করেছিলেন, আর তাঁর শাসনকালে ইসলাম ধর্ম শক্তিশালী ছিলো এবং আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। এই বিবরণ স্পষ্টভাবে তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হয়, বিশেষ করে আল-শাবী ও সিমাকের বর্ণনাগুলো, যা ইসলামকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতীয়মান করে; আর এই রওয়ায়াত স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে এই শক্তি ও ক্ষমতার সূচনা হয়েছিলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেসাল শরীফের পরে প্রথম খলীফা তথা হযরত আবূ বকর (রা:)-এর দ্বারা। অতঃপর ১২তম খলীফা পর্যন্ত এভাবে চলবে বলে ঘোষিত হয়েছিলো। আমীরে মু'আবিয়া (রা:) তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, বিশেষ করে এই কারণে যে সকল মুসলমান তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং ওই সালটিকে ঐক্যের বছর বলে অভিহিত করা হয়েছিলো।

ওপরে প্রদর্শিত প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে বোঝা যায়, হযরতে আমীরে মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রা:) বৈধ খলীফা ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলে ইসলাম ধর্ম শক্তিশালী ও আধিপত্যশীল ছিলো, আর এটা হয়েছিলো তাঁর শরীয়ত অনুসারে শাসন ও সুন্নাহ'র বাস্তবায়নের দরুন। নতুবা ইসলাম ধর্ম শক্তিশালী ও প্রভাবপূর্ণ হতো না। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

সুন্নী দৃষ্টিতে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ:

এখানে বলা জরুরি যে, হযরতে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাবর রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পণ করায় তিনি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন।[১৫৮] আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মধ্যে এটা একটা স্বীকৃত সত্য-সঠিক নীতি যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা সাধারণত জায়েজ/বৈধ নয়। ইমাম তাহাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহ) তাঁর কৃত 'আকীদায়ে তাহাবীয়্যা' গ্রন্থে বলেন:

[১৫৮] ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহমতুল্লাহি আলাইহের ইতিহাস, হযরতে মু'য়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত অধ্যায়।

لا نرى الخروج على إمامنا ولا على ولاة أمرنا وإن كانوا ظالمين، ولا نتمنى لهم الشر، ولا نتراجع عن اتباعهم. ونرى أن طاعتهم من طاعة الله سبحانه، فهي واجبة ما لم يأمرونا بالمعصية، وندعو لهم بالهداية وتجاوز عن سيئاتهم. (العقيدة الطحاوية مع شرح الغنيمي، ص ١١٠-١١١)

অর্থ: "আমরা আমাদের ইমাম বা আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দেই না, এমন কী তাঁরা যদি অন্যায়কারীও হন, তবুও আমরা তাঁদের অমঙ্গল কামনা করি না, অথবা তাঁদের অনুসরণ থেকেও সরে আসি না। আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁদের আনুগত্য করা মহান আল্লাহর আনুগত্যের অংশ, এবং তাই যতোক্ষণ না তাঁরা আমাদের পাপ করতে আদেশ দেন ততোক্ষণ পর্যন্ত এটা বাধ্যতামূলক। আমরা তাঁদের হেদায়াত এবং তাঁদের অন্যায়কে ক্ষমার জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি।"[১৫৯]

সুন্নী উলামাবৃন্দ এর পক্ষে প্রমাণসমূহ পেশ করেছেন, যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত দলিলগুলো উল্লেখযোগ্য:

(১) আল্লাহ পাক ফরমান-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থ: হে ঈমানদারবৃন্দ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের আর তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।[১৬০]

(২) হযরতে আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد

[১৫৯] আল-আকীদাতুত-তাহাবীয়্যা এবং শরহুল-গুনায়মী পুস্তকের ব্যাখ্যাসহ, পৃষ্ঠা ১১০-১১১।
[১৬০] সূরাহ নিসা, ৫৯ আয়াত; নূরুল ইরফান।

أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني». (صحيح البخاري، رقم ٦٧١٨، وصحيح مسلم، رقم ١٨٣٥)

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্যতা করলো, সে আমারই অবাধ্যতা করলো।[১৬১]

(৩) হযরতে আনাস বিন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبداً حبشياً كأن رأسه زبيبة» (صحيح البخاري رقم ٧١٤٢ وصحيح مسلم)

অর্থ: তোমাদের শাসকের কথা শুনো এবং তার আনুগত্য করো, যদিও সে একজন হাবশী দাস হয় যার মাথা কিশমিশের মতো দেখতে হয়।[১৬২]

(৪) হযরতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإنه لا يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية» (صحيح البخاري رقم ٧١٤٤، وصحيح مسلم رقم ١٨٤٩)

অর্থ: যে ব্যক্তি তার শাসককে এমন কিছু করতে দেখে যা তার অপছন্দনীয়, তার উচিত ধৈর্য ধরা; কারণ কেউ (মুসলিম) জামা'আত থেকে এক মুহূর্তের তরেও আলাদা হয়ে মারা গেলে সে (প্রাক-ইসলামী যুগের) অজ্ঞতার মাঝে মৃত্যু বরণ করবে।[১৬৩]

[১৬১] বুখারী, ৬৭১৮ ও মুসলিম, ১৮৩৫।
[১৬২] বুখারী, ৬৭২৩ ও সহীহ মুসলিম।
[১৬৩] সহীহ আল-বুখারী, নং ৬৭২৪ এবং সহীহ মুসলিম, নং ১৮৪৯।

(৫) হযরতে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, হুজূরে পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন -

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». (صحيح البخاري، رقم ٦٧٢٥، وصحيح مسلم، رقم ١٨٣٩)

অর্থ: একজন মুসলিমকে অবশ্যই (তার শাসকের আদেশ) শুনতে হবে এবং মেনে চলতে হবে, যা সে পছন্দ করে বা অপছন্দ করে, যতোক্ষণ না তাকে পাপ করার আদেশ দেয়া হয়। যদি তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা করার আদেশ দেয়া হয়, তাহলে কোনো শ্রবণ এবং কোনো আনুগত্য নেই।[১৬৪]

আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন শরীয়তসম্মত ছিলো। এ প্রসঙ্গে শরঈ দিকটি তুলে ধরেছেন কাজী আবূ ইয়ালা আল-ফার্রা'য়া হাম্বলী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) নিজ 'আহকামুস্ সুলতানীয়াহ' পুস্তকে:

يجوز للخليفة أن يعيّن خليفةً دون موافقة أهل السلطة، كما عيّن أبو بكر عمر رضي الله عنهما خليفةً له دون موافقة وحضور وجهاء الأمة. والسبب المنطقي وراء ذلك أن تعيين خليفة لا يُعدّ تعيينًا للخليفة، وإلا لكان هناك خليفتان، فلا حاجة لوجود ذوي النفوذ. نعم، بعد وفاة الخليفة، لا بد من حضورهم وموافقتهم.

অর্থ: "একজন খলীফার পক্ষে ক্ষমতাসীনদের অনুমোদন ছাড়াই একজন উত্তরসূরী নিয়োগ করা বৈধ, যেমন হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন এবং উপস্থিতি ছাড়াই তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো এই যে, কাউকে "খিলাফতের উত্তরসূরী" নিয়োগ করা তাঁকে খলীফা

[১৬৪] সহীহ আল-বুখারী, নং ৬৭২৫ এবং সহীহ মুসলিম, নং ১৮৩৯।

হিসেবে নিযুক্ত করা বলে মনে করা হয় না; নতুবা দু জন খলীফা (বর্তমান) থাকবে। তাই প্রভাবশালী গণ্যমান্যদের উপস্থিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, খলীফার ইন্তেকালের পরে তাঁদের উপস্থিতি এবং অনুমোদন প্রয়োজন।"

কাজী আবূ ইয়ালা (রহ.) আরো বলেন:

«إن الخلافة لا تقوم بمجرد تعيين الخليفة، بل تحتاج بعد وفاته إلى موافقة الأمة الإسلامية» (الأحكام السلطانية، ص٩)

অর্থ: "কেবল খলীফা নিয়োগের মাধ্যমেই খিলাফত (নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং (তাঁর ইন্তেকালের পর) এর জন্যে মুসলিম উম্মাহর অনুমোদন প্রয়োজন"।[১৬৫]

এ কারণেই হযরতে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দোষারোপ করা যায় না। কেননা, সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাবৃন্দের মতানুযায়ী তা কেবলই একটি সুপারিশ ছিলো; গণ্যমান্যদের অনুমোদন ছাড়া তা চূড়ান্ত নয়। তাই ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ইয়াযীদের দুঃশাসনের বিরোধিতা করা একদম বৈধ যা উপরের দলিলে প্রতিভাত হয়।

অতএব, ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এ ট্র্যাজেডির জন্যে হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দায়ী করা শিয়া গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার ছাড়া আর কিছু নয়।

রেফারেন্স: দক্ষিণ আফ্রিকী Islam Q&A ওয়েবসাইট।

[১৬৫] আল-আহকামুস্ সুলতানীয়া, পৃ. ৯।

ডক্টর তাহিরুল কাদেরি কি ইয়াযীদের দোসর?

লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন

(মতামত লেখকের)

মিনহাজি সম্প্রদায়সহ ইবনে সাবার নাপাক আউলাদবর্গ এই মুহাররম মাসে আহলে বাইতের চর্চা না করে প্রতিনিয়ত সাহাবি বিদ্বেষ চর্চা করছে। পথভ্রষ্ট মিনহাজি চেলাচামুন্ডাদের দাবি- কারবালার ঘটনার জন্য সাইয়্যিদুনা আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দায়ী!

অথচ মিনহাজের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর তাহিরুল কাদেরি সাহেবের স্পষ্ট কথা- সাইয়্যিদুনা আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের ব্যাপারে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি ইসলাম ও মুসলমানমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগের পিছনে কাজ করেছিল হিত ও মঙ্গল কামনা।

কাদেরি সাহেবের এই কথাগুলো বলেছেন উনার লিখিত "শাহাদাতে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু দর্শন ও শিক্ষা" বইয়ের ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠায়।

কাদেরি সাহেব লিখেন-----

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া অবশ্যই ইসলাম ও মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি খেলাফত প্রশ্নে আগেকার মতো মুসলমানদের মাঝে খুনাখুনি ও রক্তপাত চাননি। বিগত অবস্থাদির প্রেক্ষাপটে তিনি এও বুঝতেন যে, তিনি যদি খেলাফত ও ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বাদ দিয়ে দেন কিংবা কোনো কমিশনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে দেন তাহলে লোকেরা কখনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর একমত হবে না। তখন বিভিন্ন এলাকা হতে খেলাফতের অনেক অনেক দাবিদার দাঁড়িয়ে যাবে। এতে করে মস্ত এক অস্থিতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তিনি এও উপলব্ধি করতেন যে, খেলাফত যদি বনূ হাশেমকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বনু উমাইয়ার লোকেরা যারা জাতিগতভাবে অবিচ্ছিন্ন কখনো মেনে নেবে না। ফলে যুদ্ধবিগ্রহের নির্ঘাত এক ক্রমবর্ধমান ধারার অবতারণা হবে। অতএব

তিনি বনূ উমাইয়ার উপর আপন পুত্রকে প্রাধান্য দিলেন, ঐতিহাসিকদের মতে যে ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে খুবই পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত।

তিনি ভুল করুন আর শুদ্ধ করুন, এ কথাটি অবশ্য সর্বজনবিদিত যে, এসব কিছু তিনি মুসলমানদের মাঝে খুনাখুনি ও রক্তারক্তি বন্ধ করার মানসেই করেছিলেন। এ কথাটির সাক্ষী তাঁর এই দোয়াটি, যা তিনি এজিদকে দায়িত্বভার অর্পণ করার পরে করেছিলেন।

اللهم ان كنت تعلم اني وليت لانه فيما اراه اهل لذالك فاتمم له ما وليته و ان كنت وليته لاني اخبه فلا تتمم له وليته.

"হে আল্লাহ তুমি যদি জানো যে, এজিদকে আমি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্বভার অর্পণ করেছি তাহলে তুমি তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পূর্ণ করিয়ে নাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি একথা জানো যে, স্বজনপ্রীতির বশবর্তী হয়ে আমি তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছি, তাহলে তুমি তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পূর্ণ করিও না।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:৮০)

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার এই উদ্যোগকে শুদ্ধ বলুন আর ভুল বলুন, এ কথাটি কখনো অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর উদ্যোগের পিছনে কাজ করেছিল হিত ও মঙ্গল কামনা। ওলামায়ে আহলে সুন্নাত এ উদ্যোগের কথা ভেবে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্পৃক্ততার অর্থাৎ সাহাবা হওয়ার কথা বিবেচনা করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করা, তাঁর সমালোচনা করা, তাঁকে গালমন্দ করা এবং ভালমন্দ বলা হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন।

এবার পথভ্রষ্ট মিনহাজি শিয়াদের বলতে হবে, মনোনয়নের ব্যাপারে সাইয়্যিদুনা আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদক্ষেপকে সমর্থন করে কাদেরি সাহেব আহলে বাইতের দুশমন হননি?

বিশেষ দ্রষ্টব্য- আমার বিশ্বাস মতে, কারবালার ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ি নাপাক, অভিশপ্ত, বদবখত ইয়াযিদ।

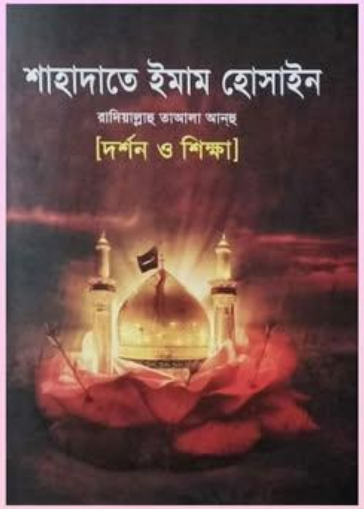

দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কুফায় এসে জড়ো হতে থাকে। তারা কুফায় সংখ্যালঘু আকারে অবস্থান নেয় এবং বসবাস করতে থাকে। এভাবে কুফা নগরী 'শীয়ানে আলী'দের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের মতবাদ :
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া অবশ্যই ইসলাম ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি খেলাফত প্রশ্নে আগেকার ন্যায় মুসলমানদের মাঝে খুনাখুনি ও রক্তপাত চান নি। বিগত অবস্থাদির প্রেক্ষাপটে তিনি এও বুঝতেন যে, তিনি যদি খেলাফত ও ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বাদ দিয়ে দেন কিংবা কোন কমিশনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে দেন, তা হলে লোকেরা কখনো কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর একমত হবে না। তখন বিভিন্ন এলাকা হতে খেলাফতের অনেক অনেক দাবীদার দাঁড়িয়ে যাবে। এতে করে মস্ত এক অস্থিতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তিনি এও উপলব্ধি করতেন যে, খেলাফত যদি বনু হাশেমকে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে বনু উমাইয়ার লোকেরা যারা জাতিগত ভাবে অবিচ্ছিন্ন কখনো মেনে নেবে না। ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের নির্ঘাত এক ক্রমবর্ধমান ধারারই অবতারণা হবে। অতএব, তিনি বনু উমাইয়ার উপর আপন পুত্র এজিদকে প্রাধান্য দিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে যে ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে খুবই পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত। তিনি ভুল করুক আর শুদ্ধ করুক, এ কথাটি অবশ্য সর্বজনবিদিত যে, এসব কিছু তিনি মুসলমানদের মাঝে খুনাখুনি ও রক্তারক্তি বন্ধ করার মানসেই করেছিলেন। এই কথাটির সাক্ষী তাঁর এই দোয়াটি, যা তিনি এজিদকে দায়িত্বভার অর্পণ করার পরে করেছিলেন।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَلَّيْتُهُ لِأَنَّهُ فِيمَا أَرَاهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ فَأَتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ

وَإِنْ كُنْتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلَا تُتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ

-হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এজিদকে আমি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্বভার অর্পণ করেছি, তা হলে তুমি তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পূর্ণ করিয়ে নাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি এই কথা জান যে,

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন [দর্শন ও শিক্ষা] ৯১

স্বজনপ্রীতির বশবর্তী হয়ে আমি তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছি, তা হলে তুমি তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পূর্ণ করিও না।'

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার এই উদ্যোগকে শুদ্ধ বলুন আর ভুল বলুন, এ কথাটি কখনো অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর এই উদ্যোগের পেছনে কাজ করেছিল হিত ও মঙ্গল কামনা। ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতগণ এই উদ্যেগের কথা ভেবে এবং নবীর সাথে সম্পৃক্ততার অর্থাৎ সাহাবা হওয়ার কথা বিবেচনা করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করা, তাঁর সমালোচনা করা, তাঁকে গালমন্দ করা এবং ভালমন্দ বলা হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আফযালীয়্যাত তথা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক বাহুল্য তর্ক ও তার জবাব

ইদানীং ফেইসবুকে এক বাহুল্য তর্ক আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কতিপয় ফেইসবুকার ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চাচ্ছেন যে প্রথম দু জন ইসলামী খলীফা সর্ব-হয়রত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও উমর ফারূক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) ফযীলতের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ (আংশিক ক্ষেত্রে হোক বা সামগ্রিক)। কেউ কেউ আবার তাঁকে 'বেলায়াতের সম্রাট'ও আখ্যা দিচ্ছেন। এই বিতর্ক এক প্রকার বেয়াদবি বলে আমার মনে হয়। কেননা সাহাবীয়্যত, বিশেষ করে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান সাহাবা (রা.)-বৃন্দের সাহাবীয়্যত মানে বেলায়াত নয়, এমন ভ্রান্ত ও গোস্তাখিমূলক ধারণা কোনো প্রকৃত মুসলমান পোষণ করতে পারেন না (যেহেতু আল-কুর'আনের সূরাহ ইউনুস ৬২ নং আয়াতে উল্লেখিত 'আউলিয়া'র প্রথম উদ্দিষ্ট প্রজন্ম হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম; এরপর পরবর্তী প্রজন্মসমূহ)। তাই স্রেফ অসৎ এজেন্ডাধারী ও তাদের ধোঁকায় পতিত অজ্ঞ লোকেরাই এ রকম ভ্রান্ত ও অপব্যাখ্যামূলক ধারণা অন্তরে লালন করতে পারে। চলুন, এই বিষয়ে খোদ হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কী সাক্ষ্য দিয়েছেন তা জানতে চেষ্টা করি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর প্রণীত 'মুসনাদ' কিতাবে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, যা'তে বিবৃত হয়:

عن عبد خير قال: قال علي لما فرغ من أهل البصرة: إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما شاء.

অর্থ: হযরত আবদু খায়র (রা.) হতে বর্ণিত; ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বসরাবাসীদের থেকে ফারেগ/অবসর হওয়ার সময় বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ জন হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); অতঃপর শ্রেষ্ঠ হযরত

উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।"[১৬৬] একইভাবে, ইমাম ইবনু কুদামা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর রচিত 'লুম'আতুল ই'তিক্বাদ' পুস্তিকায় ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর আরেকটি বাণী উদ্ধৃত করেন:

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث.

অর্থ: প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এই উম্মতের মাঝে সেরা হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); অতঃপর সেরা হলেন হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); আর আমি যদি চাইতাম, তবে তৃতীয় জনের (নাম) উল্লেখ করতাম।[১৬৭]

উক্ত পুস্তিকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা এসেছে। তাতে এই মহান সাহাবী (রা.) বলেন:

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.

অর্থ: আমরা এ কথা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (যাহেরী) হায়াতে জিন্দেগীতে বলতাম: "প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই এ কথাকে নিষেধ করেননি।[১৬৮] অতএব, চূড়ান্ত কথা হলো এসব বিশুদ্ধ

[১৬৬] মুসনাদে ইমাম আহমদ রহ:, হাদীস নং ১০৩১ (মান: সহীহ - লিঙ্ক: https://hadithprophet.com/hadith-5570.html

[১৬৭] বাংলা সংস্করণ, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা; পিডিএফ লিঙ্ক: https://docs.google.com/document/d/1BCgaCePj0VwwnnuspX0rNoSizDqUzfRByMKrDw_pqOE/edit?usp=share_link

[১৬৮] আল-বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'মানা'ক্বিব, ৩৪৬৮; সুনানে আবী দাউদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি), কিতা'বুস্ সুন্নাহ, ৪৬২৭, ৪৬২৮, ৪৬২৯; ইবনে মাজাহ (عليكم

বর্ণনার আলোকে হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই। তাঁর কথাই এক্ষেত্রে শিরোধার্য! তিনি যখন ব্যক্ত করেছেন এ সহজ-সরল কথা, তখন এর বাইরে গিয়ে তাঁর কোনো আশেক্ব ও সিলসিলাধারী দাবিদার ব্যক্তির পক্ষে টুঁ শব্দ করা তাঁর শানে বেয়াদবি বলে আমি মনে করি। বিষয়টি আরো গুরুতর হয়ে যায় যখন দেখি, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরও এই সিদ্ধান্তের প্রতি মৌন সমর্থন রয়েছে (হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুসারে সুন্নাতে তাক্বরীরী)। আশা করি, মুসলমান সাধারণ এ ব্যাপারে সতর্ক হবেন এবং অসৎ এজেন্ডাধারীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দিন, আমীন।[১৬৯]

অনলাইনে ধর্মনীতির অনুসরণ, না এজেন্ডার বাস্তবায়ন?

কতিপয় ফেইসবুকারকে দেখছি এ বিষয়টিকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা দাবি করছেন যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এ মর্মে কোনো স্পষ্ট বাণী নেই। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে নিম্নোক্ত হাদীসই তাঁদের ওই দাবিকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। মনে রাখবেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ তিন প্রকার: (১) তাঁর বাণী যা সুন্নাতে কওলী; (২) তাঁর কাজ যা সুন্নাতে ফে'লী; এবং (৩) সুন্নাতে তাকরীরী যা তাঁর সামনে করা হয়েছে, কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি। অতএব, এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল হচ্ছে নিম্নের রওয়ায়াত/বর্ণনা -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন:

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ), 'মোক্বাদ্দমা', ১০৬; সুনানে তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি), 'মানা'ক্বিব', ৩৭০৭ এবং ইমাম আহমদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি), ১:১১৪; ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন

[১৬৯] লিঙ্ক: https://docs.google.com/document/d/1BCgaCePj0VwwnnuspX0rNoSizDqUzfRByMKrDw_pqOE/edit?usp=sharing

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.

অর্থ: আমরা এ কথা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (যাহেরী) হায়াতে জিন্দেগীতে বলতাম: “প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু); এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই এ কথাকে নিষেধ করেননি।[১৭০]

বি.দ্র. এতদসংক্রান্ত দলিলসমৃদ্ধ আমার পূর্ববর্তী লেখাটি তাই আবার শেয়ার করলাম। তরুণ সুন্নী অনলাইন এ্যাকটিভিষ্টদের বলবো, এজেন্ডাধারীদের চিহ্নিত করে রাখুন এবং সবাইকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করুন, যাতে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সাহাবা (রা.)-মণ্ডলীর মধ্যে কাউকে বড় করা এবং অপর কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এসব লেখায় আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করা হতে আমি বিরত থেকেছি। বরং ইসলামী দলিলাদি হতে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাই তুলে ধরা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহতায়ালা ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট বাণী, সংশ্লিষ্ট সাহাবা (রা.)-বৃন্দের ভাষ্য ও পূর্ববর্তী

[১৭০] আল-বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘মানা’ক্বিব, ৩৪৬৮; সুনানে আবী দাউদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি), কিতা’বুস্ সুন্নাহ, ৪৬২৭, ৪৬২৮, ৪৬২৯; ইবনে মাজাহ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ), ‘মোক্বাদ্দমা’, ১০৬; সুনানে তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি), ‘মানা’ক্বিব’, ৩৭০৭ এবং ইমাম আহমদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি), ১:১১৪; ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুন্নী ইমামমণ্ডলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। যেহেতু অনলাইনে সক্রিয় কতিপয় এজেন্ডাধারী ভ্রান্ত মতবাদী ইতর লোক ফেইসবুকে দলিলাদির অপব্যাখ্যা দ্বারা এদেশের সুন্নী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে, সেহেতু এই আলোচনা করতে আমি বাধ্য হয়েছি। এতে আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হয়নি।

প্রিয়নবী (ﷺ) কর্তৃক হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নামাযে ইমামতির নিয়োগ দান ছিলো প্রতীকী

সম্প্রতি আমার লেখা প্রথম দুই খলীফা (রা.)-এর ‘আফযালীয়্যাত’/শ্রেষ্ঠত্ব-সংক্রান্ত পোষ্টগুলো এজেন্ডাধারীদের মাঝে বেশ অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। তাঁরা অনেক অপযুক্তি ও অস্পষ্ট বিষয়াদি উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, প্রিয়নবী (ﷺ) কর্তৃক আপন বেসাল শরীফের আগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে নামাযে ইমামতির নিয়োগ দানের মাধ্যমে তাঁকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নে এমন আর কী ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে? এ রকম ইমামতির জন্যে নিয়োগ তো বর্তমানে হরহামেশাই ঘটছে! মসজিদ কমিটি তো হাফেজে কুর’আনকেও নামায পড়াবার জন্যে নিয়োগ দিচ্ছে! নাঊযুবিল্লাহ মিন যালেক!

এই অপযুক্তির খণ্ডনে শুধু এতোটুকু বলবো, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে যিনি আপন বেসাল শরীফের আগে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, আল্লাহতায়ালার মাহবূব, সরকারে দো জাহান, রহমতুল্লিল আলামীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরতে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আর আমাদের যুগের মসজিদ কমিটি এক সমান হলো? বস্তুতঃ তাঁর এই নিয়োগ দান ছিলো প্রতিনিধিত্বের প্রতীকস্বরূপ - তাঁরই খেলাফত ও বেলায়াতের প্রথম প্রতিনিধিস্বরূপ, যার সাথে অন্য কারো তুলনা করা স্রেফ বেয়াদবি! যে বা যারা এ রকম তুলনা করছে সে বা তারা গোস্তাখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তারা অবশ্যঅবশ্য ইসলামের শত্রুদের মদদপুষ্ট হয়ে শত্রুতার এজেন্ডা বাস্তবায়নে অপতৎপর।

পুনশ্চঃ আরেকটি অপযুক্তি পেশ করা হয়েছে যে ইমাম মাহদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস সালাম) যখন আসবেন, তখন পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইমাম মাহদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইমামতিতে নামায পড়বেন। এতে তিনি কি ছোট হয়ে যাবেন না? এর উত্তর হলো, যিনি (দ.) হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইমামতি দিয়ে মনোনীত করেছিলেন, সেই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই ইমাম মাহদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে রূহের জগতে কর্তৃত্বদান (অথরাইজ) করেছেন, আর তিনি তা হাদীস শরীফে ঘোষণা করেছেন। তাঁর হুকুমই আমাদের শিরোধার্য।

সাহাবা (রা.)-বৃন্দের প্রতি মন্দ ধারণা রাখার বিষয়টি কবরের প্রশ্নোত্তরে প্রভাব ফেলবে কি-না?

সম্প্রতি সুন্নী ঘরানা হতে উৎপন্ন জনৈক সুবক্তা আলেম বলেছেন যে কোনো সাহাবী (রা.)-এর ব্যাপারে কী ধারণা রাখা হয়েছিলো তা কবরে ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তরের সময় জিজ্ঞেস করা হবে না। তিনি আলোচ্য হাদীসটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন মাত্র, কিন্তু আসল অংশ করেননি। সেটা আরো বিবৃত করে- "তোমার নবী কে?" এরই সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি রওয়ায়াতে এসেছে-

مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟

অর্থ: "এই যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে"?[১৭১] ওই সময় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে হাজির থাকবেন এবং তাঁকে দেখিয়েই ফেরেশতাবৃন্দ এই প্রশ্নটি করবেন। যে ব্যক্তি তাঁর সাহাবী (রা.)-এর প্রতি অপবাদ দিতো, গালমন্দ করতো, তার প্রতি যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্ট থাকবেন, তা তো বিভিন্ন হাদীসে তিনি ব্যক্ত করেই দিয়েছেন। ফলে কবরের সওয়াল-জওয়াব যে গালমন্দকারী ব্যক্তির পক্ষে যাবে না, তা তো

[১৭১] বুখারী, ১৩৩৮।

সহজেই অনুমেয়। প্রশ্নোত্তর চলাকালীন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সন্তুষ্ট ও কোমল সুন্দর অবয়বে দেখতে পারার ওপরই পরীক্ষাদাতার সাফল্য নির্ভর করবে। যাদের মনে বক্রতা বিরাজমান, কোনো রকম আকীদাগত ত্রুটি বিদ্যমান, তারা তাঁকে সেই সন্তুষ্ট সুরতে দেখতে সক্ষম হবে না।

হিজরতকালে শত্রুপরিবেষ্টিত গুহার ভেতরে হযরত আবূ বকর (রা.) নিজের জন্যে দুঃখ করেছিলেন কি?

আফসোস, শিয়ালের দল যেমন বিভিন্ন দিক হতে 'হুক্কা হুয়া' রবে ডেকে উঠে, ঠিক তেমনি দেশে-বিদেশে অবস্থানকারী সাহাবা (রা.)-বিদ্বেষী শিয়াচক্রও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ফেইসবুকের বিভিন্ন কোণা থেকে আকস্মিক চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। অতি সম্প্রতি এরকম একটি পোষ্ট আমার নজরে পড়েছে, যেখানে হিজরতকালে শত্রুপরিবেষ্টিত গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁরই সাহাবী হযরতে আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে মূল লিপির বিকৃতি সাধন করা হয়েছে এবং তা দ্বারা হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ মর্মে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তিনি নাকি ওই সময় নিজের জন্যে দুঃখিত হয়েছিলেন। নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক!

চলুন, আল-কুর'আনের মূল লিপিতে কী বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যাক এবং তাফসীরকারের ভাষ্যও তুলে ধরা যাক। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا.

অর্থ: (যখন তাঁরা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন), যখন আপন সঙ্গীকে (নবী পাক) ফরমাচ্ছিলেন, 'দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[১৭২]

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আশরাফী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়াতের তাফসীরে লেখেন:

[১৭২] আল-কুর'আন, ৯/৪০; নূরুল ইরফান।

"আমার জন্যে দুঃখ কোরো না (لَا تَحْزَنْ)।" কেননা সিদ্দীক্বে আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মনে নিজের জন্যে দুঃখ ছিলো না। নিজেকে তো (গুহার ভেতরে) সাপ দিয়ে দংশন করিয়েছিলেন (যাতে নবী পাককে সেটা দংশন না করে)। হুযূরের (দ.) প্রতি উৎসর্গ হয়েছিলেন। যদি নিজের জন্যে দুঃখ থাকতো, তবে হুযূরকে (দ.) কাঁধের উপর উঠিয়ে এগারো মাইল অতিক্রম করে পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতেন না। আর একাকী অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করতেন না। সাপ দ্বারা নিজেকে দংশন করাতেন না। তাঁর এ দুঃখও ইবাদত ছিলো। বস্তুতঃ তাঁকে হুযূরের (দ.) সান্ত্বনা দেওয়াও ইবাদত। সুতরাং মহান রব/প্রভু ওই দুই মহান ব্যক্তিত্বকে মাকড়সার জাল ও মাদী-কবুতরের ডিম দ্বারা রক্ষা করেছেন।[১৭৩]

এর সাথে আমি আরো যোগ করবো, মক্কার কুফফার প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্যে ১০০টি উট পুরস্কারস্বরূপ ঘোষণা করেছিলো। হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কোনো এক জিহাদে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাঁবু রাতে পাহারা দেওয়ার কথা সাহাবা (রা.)-বৃন্দ আলোচনায় আনার সাথে সাথে অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে হযরতে আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তরবারি হাতে উঠে দাঁড়ান এবং প্রহরাস্থলে অবস্থান নেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-মণ্ডলী তাঁর তেজস্বিতা ও সাহসিকতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এগুলো ইতিহাসের ঘটনা যা বিভিন্ন বইয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব, কিছু গণ্ডমূর্খ লোকের ফেইসবুক পোষ্টে এ ব্যাপারে কুৎসা রটনা করা হলে সুন্নী মুসলমান সমাজ তাতে বিভ্রান্ত হবেন না।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত ইবনুল হানাফীয়্যা (রা.)-এর বর্ণনায় ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু.)-এর প্রদত্ত ভাষ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে "প্রিয়নবী

[১৭৩] সূরাহ তওবাহ, ৪০ আয়াত, ১১৩ নং টীকা; নূরুল ইরফান।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে" খায়র (خَيْر) তথা সেরা (ব্যক্তিত্ব) হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।[১৭৪]

'খায়র' শব্দটি ব্যাখ্যা করা দরকার। কেননা মহাভ্রান্ত শিয়াচক্র এর ব্যাপক অর্থকে ধামাচাপা দিয়ে দাবি করে থাকে যে হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) 'খায়র' শব্দটি ব্যবহার করে স্রেফ উত্তম বুঝিয়েছেন, কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বকে উদ্দেশ্য করেন নি। বস্তুতঃ এটা তাদের অপব্যাখ্যা ও খণ্ডিত চিত্র প্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়। এর দলিল হচ্ছে হযরত হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস -

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهَذَا الْخَيْرِ.

"আমি (মানে হুযায়ফাহ) বল্লাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), নিশ্চয় আমরা ছিলাম অজ্ঞতা ও মন্দের (তথা অকল্যাণের) মধ্যে (নিমজ্জিত), অতঃপর আল্লাহতায়ালা আমাদের এনে দিয়েছেন এই খায়র/কল্যাণ তথা দ্বীন-ইসলাম (জ্ঞান যা অজ্ঞতা ও মন্দের বিপরীত)"।[১৭৫] প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেন-

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"আল্লাহ্ যার খায়র/কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন"।[১৭৬] এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে খায়র ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যকৃত।

[১৭৪] [রেফারেন্স: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (হযরতে ইমামে আলী ইবনু আবি তালিবের পুত্র) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين (رواه البخاري ٣٦٧١)

"আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন, 'আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারপর কে?' তিনি জবাবে বললেন, 'তারপর 'উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।' আমি ভয় পেয়েছিলাম যে তিনি 'উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আপনি কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন মাত্র'। (আল-বুখারী, ৩৬৭১)

[১৭৫] মুসলিম শরীফ, ৪৬৭৯।

[১৭৬] বুখারী শরীফ, ৭৩১২।

সারবস্তু হলো, এই খায়র-বরকত প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোচ্চ পরিমাণে হযরতে আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ই ধারণ করেন! এ তো স্বয়ং ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর ভাষ্য! দুঃখিত শিয়াচক্র, তাঁর কথা না মানাটা তাঁরই প্রতি স্রেফ বেয়াদবি ছাড়া কিছু নয়। আমরা সুন্নীরা এখানে লাচার। ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর এই কথাই আমাদের শিরোধার্য! তিনি তাঁর কথা না মানলে (ভীতিকর) প্রহারের হুমকিও দিয়েছেন একটি বর্ণনায়! অতএব, (আখেরাতে) তাঁর উত্তম-মধ্যমের জন্যে তৈরি থেকো, ওহে শিয়া গোষ্ঠী!

[বি.দ্র. বেশির ভাগ তরীকতের সিলসিলাহ হযরতে ইমামে আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু হতে এসেছে বলে তাঁকে শিয়াচক্র শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পছন্দকে তারা অবজ্ঞা করে চলেছে। সাহাবীয়্যত যে বেলায়াতের সর্বোচ্চ স্তর, এ কথা তারা বিস্মৃত হয়। যদি তাই না হবে, তবে গাউছে পাক বড়পীর সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি কেন হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মোকাবিলায় নিজেকে এতো ক্ষুদ্র বিবেচনা করলেন? অতএব, তরীকতের কথা বলার সময় আদব বজায় রাখুন! ফেইসবুকে ইদানীং কতোগুলো এজেন্ডাওয়ালা বেয়াদবের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি।]

রেফারেন্স লিঙ্ক:

https://ahlussunnahbd.wordpress.com/2023/06/06/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%b9%e0%a6%af%e0%a6%b0%e0%a6%a4-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a7%82-%e0%a6%ac%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%93-%e0%a6%89%e0%a6%ae%e0%a6%b0-%e0%a6%b0/?fbclid=IwAR1xB_FF9ulFTy9wafVf0OwCFq7ylGNhVfzpZaVSBdAraJYC528y8KwnVPU

সুন্নী ছদ্মবেশী শিয়া মৌ-লোভীদের প্রতি প্রশ্ন

এ মুহর্রমে বেশ কিছু সুন্নী ছদ্মবেশী গলাবাজ শিয়া মতবাদী মৌ-লোভীর উগ্র ভাষণ শুনলাম, যা না শরীয়তের দলিলভিত্তিক, না ইতিহাসনির্ভর। তারা ইয়াযীদের জন্যে হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে দায়ী করেছে। অথচ হযরতে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে নি। তাই আমরা ওই সব মৌ-লোভীকে কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করছি, যার সদুত্তর তারা দেবে আশা করি।

প্রশ্ন

(১) আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে তিনি ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন নি কেন, যদি তাঁর অন্তরে ইয়াযীদের মতো বিদ্বেষ থাকতোই? মনে রাখবেন, তাঁর শাসনামল প্রায় ২০ বছর ছিলো - ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষমতা তাঁর বরাবর হস্তান্তরের পরবর্তী সময়কালে। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি ওই লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা নেন নি কেন?

(২) সুন্নী ইমাম-উলামা ও ইতিহাসবিদবৃন্দ পয়েন্ট উত্থাপন করেছেন যে তিনি তাঁর শাসনামলে হিংস্র জল্লাদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরা'র গভর্নর নিয়োগ করলেও ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আবাসভূমি হারামাইন শরীফাইনে নিয়োগ করেন নি। যদি তাঁর অন্তরে দুরভিসন্ধি থাকতোই, তাহলে তিনি তাকে হারামাইন শরীফাইনে নিয়োগ করতেন। সুন্নী জ্ঞান বিশারদদের যুক্তির পাল্টা কোনো সদুত্তর মৌ-লোভীদের কাছে আছে কি?

(৩) আমরা জানি যে আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জীবন সায়াহ্নে হারামাইন শরীফাইন গমন করেন এবং সেখানকার গণ্যমান্যদের কাছে ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারে সম্মতি চান। এঁদের মধ্যে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের প্রশ্ন: এমন কোনো

প্রামাণ্য দলিল কি মওজূদ আছে, যা'তে পরিদৃষ্ট হয় যে ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমীরে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে তৎক্ষণাৎ ভিন্নমত পোষণ করে ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন? কেননা হযরতে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অসীয়তনামায় হযরত ইমাম (রা.) ও আহলে বাইত (রা.)-কে 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়' বলেছিলেন। তাই জানতে চাই, পুরো ২০ বছরের শাসনামলের কোনো মুহূর্তে হযরত ইমাম (রা.) কর্তৃক তাঁর বিরোধিতা বা প্রতিবাদের নজির মৌ-লোভীরা দেখাতে পারবে কি?

(৪) এক মৌ-লোভী ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-এর ইতিহাস পুস্তকের নামে দুর্বল/জাল রেফারেন্স টেনে দাবি করেছে, হযরতে মু'য়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নাকি জোর-জবরদস্তি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সবার সম্মতি আদায় করেছিলেন! কাকে বুঝ দিচ্ছে এই লোক? ইমাম হুসাইন (রা.) ছিলেন 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) হযরতে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর পুত্র। সাহসিকতায় তিনি ছিলেন তাঁরই পিতার প্রতিচ্ছবি! কারো রক্তচক্ষু দেখে তিনি ঘাবড়ে যাবেন মর্মে যে লোক দাবি করে, সে ধর্মীয় জ্ঞানে সত্যি এক গণ্ডমূর্খ ও উজবক! যে ইমাম (রা.) কারবালায় ৪০০০ সেনাকে প্রায় একাই মুকাবিলা করার সৎসাহস রাখেন, তিনি ভড়কে যাবেন একজন পরলোক-পথযাত্রী বয়োবৃদ্ধকে? আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে যাঁরা তখনো জীবিত ছিলেন, তাঁরাও কি ভয়ে কাঁপবেন? এঁরা তাঁরাই, যাঁরা জীবনপণ করে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ডাকে জ্বিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদেরকে নিজেদের মতো ভীতুর ডাল মনে করতে পারে একমাত্র গবেট শিয়াপন্থী মৌ-লোভীচক্রই!

পাকিস্তানী দেওবন্দী ঘরানার আলেম মওলানা মুহাম্মদ নাফেঈ তাঁর 'রুহামা' বাইনাহুম' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে 'আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি অভিযোগ ও তার খণ্ডন' অধ্যায়ে লেখেন:

ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য

শিয়াদের প্রাথমিক তাফদিলি ঐতিহাসিকদের অন্যতম আহমদ ইবনে আবী দাউদ আদ্-দিনাওয়ারী আশ্-শিয়া (মৃত্যু: ২৮২ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত 'আল-আখবার আৎ-তিওয়াল' গ্রন্থে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু'-এর কাছে সাইয়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাই'আতকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা সাইয়্যিদুনা হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাই'আত ছাড়াও এটা পেশ করবো, যাতে এই বিষয়ে দুই ভাইয়ের মতামত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

আদ্-দীনাওয়ারি লিখেছেন যে হুজ ইবনে আদী নামে এক ব্যক্তি সাইয়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর একনিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যে ছিলো। সাইয়্যিদুনা হাসান এবং সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে সন্ধিচুক্তির পরে সে শেষোক্ত জনের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলো। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হয়, কেননা সাইয়্যিদুনা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। এরপর সে সাইয়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে চায়।

فقال الحسين إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل إلى نقض بيعتنا.

অর্থ: অতঃপর হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, "আমরা বাই'য়াত তথা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। আর তাই আমাদের আনুগত্য ভঙ্গ করার কোনো পথ/উপায় নেই।"[১৭৭]

আরো সূক্ষ্ম বিষয়

সায়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে শিয়া ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ আরেকটি ঘটনা সন্ধিচুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সাইয়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর

[১৭৭] আল-আখবার আৎ-তিওয়াল, পৃষ্ঠা-২২০, মুয়াবিয়া এবং জিয়াদ ইবনে আবিহের খিলাফতের প্রতি আনুগত্যবিষয়ক আলোচনা, কায়রো সংস্করণ, মিশর, ১৯৬০ ছাপা।

দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আরো আলোকপাত করে। শিয়া আদ্-দিনাওয়ারী বলেছেন যে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মদীনার গভর্নর তাঁকে জানিয়েছিলেন যে সাইয়্যিদুনা হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করছেন। এরপর সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি লেখেন এ মর্মে যে, ষড়যন্ত্রকারীরা আপনাকে উস্কানি দেয়ায় অপতৎপর, তাই দয়া করে এ থেকে বিরত থাকুন। সাইয়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর শঙ্কাকে দূর করেন এ বলে:

فكتب إليه الحسين رضي الله عنه ما أريد حربك و لا الخلاف عليك قالوا و لم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوء في أنفسهما ولا مكروها ولا قطع عنهما شيئا مما كان شرط لهما و لا تغير لهما عن بر.

অর্থ: ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে লিখেছিলেন, "আমি আপনার সাথে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ করার ইচ্ছা রাখি না।"

লেখক আরো যোগ করেন: সর্ব-ইমাম হাসান বা হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কারোরই দুনিয়ার জীবনের শেষ অবধি হযরতে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কোনো দ্বন্দ্ব বা মন্দ কিছুর অভিজ্ঞতা হয়নি, না তাঁদের সাথে তাঁর কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হয়েছিল, না তিনি তাঁদের সাথে করা সন্ধিচুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, না তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর উদারতার পরিবর্তন করেছিলেন।[১৭৮]

সংক্ষেপে, সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ যে, তিনি সাইয়্যিদুনা হাসান এবং সাইয়্যিদুনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার অধিকার হরণ করেছিলেন, সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করেছিলেন এবং বনূ হাশিম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১৭৮] শিয়া ইতিহাসবিদ আদ্-দিনাওয়ারী কৃত 'আল-আখবার আৎ-তিওয়াল,' পৃষ্ঠা-২২৫, মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যকার আলোচনা অধ্যায়, কায়রো সংস্করণ, মিশর।

সাল্লামের পরিবারের সাথে খারাপ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, যার কারণে এই ব্যক্তিত্বন্দ সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো শিয়া ঐতিহাসিক আদ্-দিনাওয়ারী থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি শিয়া মতবাদের অনুসারী এবং ইমাম ইবনু জারীর আৎ-তাবারী, আল-জাযারী এবং অন্যান্যদের (রহমতুল্লাহি আলাইহিম)-এর চেয়েও আগের। তিনি তাঁর উপরোক্ত দলিলপত্রের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো চমৎকারভাবে সমাধান করেছেন। আশা করি ন্যায়পরায়ণ মেজাজের অধিকারী ব্যক্তিবৃন্দ এগুলোকে স্বীকার করে নেবেন এবং পরবর্তী (শিয়াপন্থী) ঐতিহাসিকদের মতামতকে মূল্যহীন এবং তুচ্ছ জ্ঞান করবেন।[১৭৯]

সমাপ্ত

[১৭৯] মওলানা নাফেঈ রচিত 'রুহামা বাইনাহুম', ৪র্থ খণ্ড, মাহাজ্জাহ-ডট-কম সাইট, হযরতে মু'য়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি উত্থাপিত অভিযোগ ও তার খণ্ডন অধ্যায়।